নীল পাথর

ওবায়েদ হক

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়। দেশ রাজনৈতিক উত্তেজনার ঝড় ওঠার আগে ঝিমিয়ে পড়েছে, কিন্তু পাহাড়ের অবস্থা বিপরীত। ভদ্র, আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে সেখানে। খুন, হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পাহাড়ি-বাঙালিদের দ্বন্দ্ব তখন চরমে।

সরকারি কর্মকর্তাদের শাস্তি দেয়া হতো পাহাড়ে পোস্টিং দিয়ে। সে শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম ছিল না। ম্যালেরিয়া কিংবা সাপের দংশন থেকে বেঁচে গেলেও উগ্রপন্থী সংগঠনগুলো থেকে বাঁচার উপায় ছিল না। অনেকে চাকরিই ছেড়ে দিত। ঠিক সে সময় অনাথ আশ্রমে বড় হওয়া ডাক্তার মানিক মিত্রের পোস্টিং হয় বান্দরবানের দুর্গম এলাকায়। তার জীবনে আবর্তিত হতে থাকে অনেক কাঙ্ক্ষিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। সে মুখোমুখি হয় সত্যের, হিংসার, ঘৃণার, ভালোবাসার, মৃত্যুর এবং নীল পাহাড়ের

নীল পাহাড়

ওবায়েদ হক

কাকলী প্রকাশনী

©
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৫

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
মেজর এমরান

কম্পোজ
সূচনা কম্পিউটার্স
suchana10@yahoo.com

মুদ্রণ
এক্সেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৫ প্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১১০০

মূল্য ১৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-70133-0516-3

ঘরে বসে বই পেতে অর্ডার করুন : ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
অথবা লগ অন করুন : www.rokomari.com

আমেরিকার পরিবেশক ঃ মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ঃ সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
জার্মান পরিবেশক ঃ স্টেডেনজার গাটাম, ৬৩ ক্লন, জার্মান
সুইডেন পরিবেশক ঃ ভাসবে, স্টকহোম, সুইডেন

উৎসর্গ

আমার তিন ভাগ্নে–মেহদী, নীর এবং সুপ্ত-কে।

যারা আমার অনেক লেখা উড়োজাহাজ বানিয়ে আকাশে উড়িয়েছে। আমার আগের বইটিতে তাদের নাম না দেখে তারা খুব হতাশ হয়েছিল এবং হতাশ হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, আমার নাম কেটে তাদের নাম বসিয়েছিল। এবার আশা করি আর কাটাকাটি করতে হবে না।

ভূমিকা

আমার শৈশব কেটেছে চাকমাদের সাথে। তারা পাহাড় থেকে বিতাড়িত হয়ে আমাদের শহরে আশ্রয় নিয়েছিল। বছরের প্রথমদিকে ক্যালেন্ডারের কিছু তারিখে গোল চিহ্ন দিয়ে রাখত তারা। সেই তারিখে তারা পাহাড়ে যেত। মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার কারণে পরে আর যাওয়ার সাহস করত না, বিরস মুখে আমাদের সাথেই 'বিজু' পালন করত। তাদের চোখে পাহাড়ের জন্য আকুতি দেখতাম। সেই আকুতিটা এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি, কতটুকু পেরেছি তা একমাত্র পাহাড়িরাই ভালো বলতে পারবে।

এই উপন্যাসটাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা হলে ভুল হবে আর ঐতিহাসিক উপন্যাস বললে মহাভুল হবে। এটা শুধু এক বাঙালি ডাক্তারের গল্প, যে পাহাড়কে উপলব্ধি করতে পেরেছে। কিন্তু গল্পটি একেবারে অবাস্তব নয়। পাহাড়ে ক্রাসিমা, মংতো, থুইনুপ্রুরা আছে, হয়তো অন্য কোনো নামে।

২৮/০৮/২০১৪ ওবায়েদ হক

চাঁদটা ডুবে গেছে কিছুক্ষণ আগে, বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আর জোছনা ঢুকছে না। রাতজাগা পশুপাখিগুলোও এখন জেগে নেই। একটু পরেই ভোরের আলো ফুটবে। সেই আলো মানিক দেখতে পারবে কি না জানে না সে।

গহীন পাহাড়ে শুধুমাত্র এই সময়টাতেই সব কিছু শান্ত থাকে। বাতাসও কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে যায়, গাছের পাতায় সুড়সুড়ি দেয় না, খিলখিল করে হেসে ঢলে পড়ে না পাতাগুলো। অজানা পাখিরাও কোলাহল করে না। শিকারি জন্তুর ভয়ে আর্তনাদ করে না শিকারেরা। মানিক কান পেতে আছে, চোখ মেলে আছে। যাওয়ার আগে যা পারে সব চোখ ভরে দেখে নিতে চায়, সব শব্দ শুনে নিতে চায়। কিন্তু এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটুও আলোর রেখা অবশিষ্ট নেই, পৃথিবীটাও হঠাৎ করে যেন বোবা হয়ে গেছে। তাকে বিদায় দেয়ার আগে হয়তো আর মায়া বাড়াতে চায় না। মানিক অপেক্ষা করছে তার হত্যাকারীদের পদশব্দের জন্য। বাঁশের সিঁড়িতে মচমচ শব্দটা হয়তো শ্রুতিমধুর হবে, সে একটু শ্রুতিমধুর শব্দের জন্য কাঙাল হয়ে আছে। তাকে পাহারা দেয়ার জন্য যেই লোকটাকে রাখা হয়েছিল সে তার কাজে ইস্তফা দিয়ে এখন নাক ডাকছে। মরার আগে নাক ডাকার শব্দ শুনে মরতে চায় না মানিক।

মানিকের হাত-পা বাঁধা আছে, যদিও হাত-পা বাঁধার প্রয়োজন ছিল না, ঘুমন্ত পাহারাদারের চোখ ফাঁকি দিতে পারলেও পাহাড়কে ফাঁকি দেয়া তার পক্ষে সম্ভব না। তার পায়ের জখমটা এখনো টাটকা, রক্তগুলো জমাট বেঁধে কালচে হয়ে গেছে, মাথার পেছনের দিকটাতে চুলগুলো জট পাকিয়ে গেছে জমাট বাঁধা রক্তে। মানিক নিজের হাতের মুঠোতে শক্ত করে ধরে রাখা চিঠিটি খুলল। এই চিঠিটি সে এর আগে হয়তো কয়েক শত বার পড়েছে, মনে মনে পড়েছে হয়তো হাজার বার। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষরের

বাঁক তার মুখস্থ। তাই অন্ধকারে চিঠিটি পড়তে তার অসুবিধা হলো না। সারাজীবন যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে সে তা এই চিঠিতে আছে। সেই উত্তরটা তার পছন্দের নয়, তারপরও উত্তর আছে। চিঠিটা যতবার পড়েছে ততবার সে কেঁদেছে, স্বস্তিতে, কষ্টে কিংবা অপারগতায়।

একটা দিনের জন্য যদি সে মুক্তি পেত তবে এই মৃত্যুটাও হয়তো অনেক স্বস্তির হতো।

নাক ডাকার শব্দ ছাপিয়ে বেশ কিছু শব্দ একসাথে শুনল মানিক। ফিসফিস শব্দে মানুষের গলা শুনতে পেল সে। তারপর বাঁশের সিঁড়িতে কয়েকটা পায়ের শব্দ। মাচার উপরে বাঁশের ঘরটার দরজা খোলাই ছিল, অন্ধকারে বেশ কয়েকটা মূর্তি ঘরে ঢুকল।

মানিক চোখ বন্ধ করল, সে যেন তার সম্পূর্ণ জীবন দেখতে পেল কয়েক মুহূর্তে।

১৯৮৪ সালের গ্রীষ্মের কোনো এক দুপুরে মানিক লোকাল বাসে বসে আছে। সে বসেছে জানালার পাশে, রোদে গা জ্বলে যাচ্ছে। খালি পেটে এই অনিচ্ছাকৃত রৌদ্রস্নানে মানিকের মাইগ্রেনের ব্যথাটা টিপ টিপ করে বাড়ছে। খালি পেটেই ক্যান্টিনের চা খেয়েছিল, এখন বমি বমি লাগছে। গ্যাস্ট্রিকটা বেশ ভালোই বাধিয়েছে সে। বাস ভর্তি লোকজন, তারপরও কোনো এক অজানা কারণে বাস ছাড়ছে না ড্রাইভার। সবচেয়ে বিরক্তি লাগছে ড্রাইভার ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বাসটাকে ইঞ্চি দুয়েক সামনে নিয়ে আবার পেছনে এনে সামনে-পেছনে দোলাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখনি ছেড়ে দিবে, এরকম মনে হওয়াটা পনেরো মিনিট ধরেই হচ্ছে। জানালার পাশে বসা রোদে পুড়তে থাকা লোকগুলো ক্ষেপে ড্রাইভারকে গালি দিচ্ছে, ড্রাইভার তাদের দিকে না তাকিয়ে সিটে পা তুলে, চোখ বন্ধ করে দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান চুলকাচ্ছে। তার মুখ দেখে বুঝা যাচ্ছে সে খুব আরাম পাচ্ছে, যাত্রীদের গালির কারণে তার সে আরামে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। মানিকের পাশে বসা লোকটি এই নরকের মতো পরিবেশেও তার কাঁধে মাথা দিয়ে ঘুমাচ্ছে। এরকম প্রায়ই হয় আজকাল। তার কাঁধটা যেন জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে গেছে। আগে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দিত, লজ্জা পেত লোকগুলো তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ত তার কাঁধে মাথা রেখে। এখন আর সরায় না, সেদিন ঘুমিয়ে থাকা এক লোকের মুখ থেকে লালা গড়িয়ে তার শার্ট ভিজে গিয়েছিল, সে খুব যত্নের সাথে লোকটিকে না জাগিয়ে রুমাল দিয়ে নিজের শার্ট এবং লোকটির মুখ মুছে দিয়েছিল।

মুরগির খাঁচার মতো লোক ঢুকানো হয়েছে বাসে। হাত-পা নাড়ানোর উপায় নেই। পিজি হাসপাতাল থেকে যেসব চর্ম রোগীরা বাসে উঠে তাদের খুব অসুবিধায় পড়তে হয়, প্রচণ্ড চুলকানি হয় তবুও নড়াচড়ার উপায় নেই। এই ভিড় ঠেলে বাতাসও ভেতরে ঢুকতে পারে না কিন্তু বাসের কন্ডাক্টর কীভাবে যেন ঠিকই মানুষজন পেরিয়ে ভাড়া তুলতে এসে যায় এই কন্ডাক্টরটা স্মৃতিশক্তির সমস্যায় ভুগছে। ভাড়া দেয়ার পরও মানিকের কাছে তিনবার ভাড়া চেয়েছে। বকশীবাজার পৌঁছতে পৌঁছতে বোধ হয় আরো কয়েকবার চাইবে।

রাস্তায় মানুষ হাত তুললেই বাস ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, বাসের অবস্থা যাই হোক ব্রেক খুব ভালো। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক রাস্তার ওপাশে থাকা বন্ধুর দিকে হাত নাড়ছিলেন, তাই দেখে বাস থেমে গেল লোকটার সামনে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই হেলপার তাকে টেনে বাসে তুলে ফেলল এবং ভিড়ের মধ্যে ঠেলে দিল। বাসে কোনো এক অজানা কারনে কেউ পিছনে যেতে চায় না। যে একেবারে শেষ পর্যন্ত যাবে সেও চেষ্টা করবে দরজায় দাঁড়াতে। আর পরের স্টপেজের লোকগুলো কেন যেন পেছনেই বসে। বাস থামার পর সব যাত্রীকে ঠেলে তাদের নামতে পাঁচ মিনিট লেগে যায়। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কন্ডাক্টর পেছনে টানতে টানতে বলল—

কই যাইবেন মুরুব্বি?

ভদ্রলোক চোখ পাকিয়ে বললেন—

আমাকে মুরুব্বি ডাকবে না।

কনডাক্টর মুচকি হেসে বলল—

আইচ্ছা আঙ্কেল, যাইবেন কই?

বৃদ্ধলোকটি এবার দাঁত চিবিয়ে বললেন—

যেখান থেকে জোর করে উঠিয়েছ সেখানেই যাব, ইডিয়ট কোথাকার।

কন্ডাক্টর বলল—

জোর করছে আর আপনেও উইঠ্যা পড়লেন, আইচ্ছা খাড়ান, সামনে নামাই দিতাছি।

বলেই হেল্পারের উদ্দেশ্যে পশ্চাদ্দেশ সম্পর্কীয় খুবই অশ্লীল একটা গালি দিয়ে বৃদ্ধের ক্রোধকে পাত্তা না দিয়ে চলে গেল। হেল্পারদের কাজ হেল্প করা কিন্তু প্রায়শই তারা উল্টোটাই করে। সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালের হেল্পাররা অবশ্য ব্যতিক্রম, তারা পারলে মানুষজনকে কোলে করে বাসে ওঠায়, যারা যেতে চায় না তাদেরও : একবার ঢাকার জেলা প্রশাসক দলবল নিয়ে সায়েদাবাদ গিয়েছিলেন টার্মিনাল পরিদর্শনে। দল থেকে একটু সামনে চলে এসেছিলেন। এক হেল্পার "নোয়াখালী যাইবেন"? বলেই তাকে নোয়াখালীর এক বাসে ঠেলে উঠিয়ে দিল। জেলা প্রশাসক বারবার বলছে—

এই করছ কি, আমি যাব না।

হেল্পার বলছে—

আরে বুঝছি, কিছু কম দিয়েন সমস্যা নাই।

জেলা প্রশাসক আবার বললেন—

আমি ঢাকার ডিসি।

ডিসি কী জিনিস হেল্পার বুঝে না, সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ড্রাইভারের দিকে তাকাল, ড্রাইভার পান চাবাতে চাবাতে বলল—

স্যারেরে ভিআইপি সিটে বহা, আর ভাড়া হাফ লইছ।

পরে ডিসি সাহেবের অধস্তনরা এসে তাকে উদ্ধার করল, নয়তো ঢাকার জেলা প্রশাসক বদলির অর্ডার ছাড়াই নোয়াখালী চলে যেত।

আরেকবার দুই হেল্পার নতুন বিয়ে করা দম্পতিকে নিয়ে টানাটানি করছিল, পরে তারা ভাগাভাগি করে একজন জামাই নিয়ে গেল আরেকজন বউ। বউ কেঁদেকেটে জামাইয়ের কাছে ফিরেছিল। আর কারো কাছে যদি বড় ব্যাগ থাকে, তখন তারা যাত্রীকে ছুঁবেও না, ব্যাগ নিয়ে বাসে রেখে আসবে। এক্ষেত্রে তারা 'কান টানলে মাথা আসে' সূত্র কাজে লাগায়।

মানিক লক্ষ করল কন্ডাক্টরের আসলেই স্মৃতিশক্তির সমস্যা আছে, সে বৃদ্ধকে নামানোর ব্যাপারটা বোধহয় ভুলে গেছে। পেছনে গিয়ে কার কাছে যেন চতুর্থবার ভাড়া চেয়ে ঝাড়ি খাচ্ছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি উশখুশ করছেন, পাশের লোকটি রীতিমতো তার উপর ঢলে পড়ছে কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারছেন না। কটমট করে চারিদিকে তাকাচ্ছেন, কিন্তু লোকাল বাসে এই দৃষ্টির মর্মার্থ কেউ বুঝে না কিংবা বুঝতে চায় না। এখানে ভদ্রতার বালাই নেই, পায়ে পা পড়লে হাত দিয়ে সালাম করার রীতি নেই, ভুঁড়ি দিয়ে চেপে কোণঠাসা করে দেয়াও এখানে অন্যায় নয়, ঘামযুক্ত বগল নাকে চেপে ধরলেও সেটা প্রতিবাদযোগ্য নয়, এখানে কেউ বড় নয় কেউ ছোট নয়। বৃদ্ধ লোকটি এখন অসহায়ভাবে জানালা দিয়ে রাস্তা দেখার চেষ্টা করছেন, দুই-একবার কন্ডাক্টরকে ভারী গলায় ডেকেছেন কিন্তু সেই শব্দ পাশে দাঁড়ানো ভীমের মতো লোকটার ভুঁড়ি পর্যন্ত গিয়েই মিলিয়ে গেল। বুঝা যায় লোকাল বাসে চড়ে অভ্যাস নেই লোকটার। মানিকের কেন যেন তাঁকে চেনা চেনা মনে হয়। কিন্তু মনে করতে পারছে না। বাস বকশীবাজারে পৌঁছে গেল। বৃদ্ধ মানুষটিও কোনোমতে তার পেছন পেছন নামল। উনাকে দেখে খুব সম্ভ্রান্ত মনে হয়, মুখে দাড়ি নেই কিন্তু চুল সব সাদা, মুখের ভাঁজ দেখে বয়স অনুমান করা যায়। হেঁটে হেঁটে কোথাও যাচ্ছিলেন হয়তো, মাঝপথেই অপহরণের শিকার হলেন। মানিক লোকটির দিকে তাকাল, এতক্ষণে চিনতে পেরেছে। ইনি ডা. বদরুল আলম। পিজি হাসপাতালের নতুন পরিচালক। গত সপ্তাহে জয়েন করেছেন, প্রথম দিন সবার সাথে হাত মিলিয়ে পরিচিত হয়েছিলেন। তাকে লোকাল বাসে দেখে চিনতে পারেনি মানিক। মানিক কাছে গিয়ে বলল—

স্যার আদাব।

বদরুল আলম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল—

কে তুমি?

মানিক বলল—

স্যার আমি ডা. মানিক মিত্র। সার্জারিতে আছি।

বদরুল আলম যেন প্রাণ ফিরে পেল। একটু আগের অপরিচিত ছেলেটিকে এখন যেন বড্ড আপন মনে হচ্ছে। তিনি বললেন—

দেখো তো এদের অবস্থা, হাঁটতে দিবে না মানুষকে, জোর করে হলেও বাসে তুলে নিবে। চোর-ডাকাত আর ভয় পাই না আমি কিন্তু এই লোকাল বাস দেখলেই কলিজা কেঁপে ওঠে।

বলেই হেসে উঠলেন। এতক্ষণ খুব বিরক্ত লাগছিল, এখন যেন পুরো ব্যাপারটা কৌতুক হয়ে গেল।

মানিক বলল—

স্যার আমি আপনাকে পৌঁছে দেব, চিন্তা করবেন না।

বদরুল আলম বললেন—

সমস্যা নেই, হাঁটতে বের হয়েছি, হাঁটতে হাঁটতেই চলে যাব, দুপুরে হাঁটলে ঘাম বেশি ঝরে। কিন্তু এখনো লাঞ্চ করা হয়নি আমার। ভালো খাবার পাওয়া যাবে কোথায়? চলো কিছু খেয়ে নেই।

মানিক বলল—

আমারও হয়নি, চলুন স্যার।

বাস থেকে নেমে বংশালের কেরামত হোটেলে দুপুরের খাবার খায় মানিক। সে কেরামত হোটেলের বাঁধা খদ্দের। কেরামত হোটেলের রান্নার খুব নামডাক। তাদের সব তরকারিতে তেলের অতিরিক্ত উপস্থিতি এই নামডাকের একটা কারণ। অনেকে ঠাট্টা করে বলে—

কেরামত মিয়ার তেলের খনি আছে। কোলেস্টেরল শব্দটা এখনো এই অঞ্চলে ভীতি জাগাতে পারেনি। তাই কেরামত মিয়ার হোটেলে খদ্দেরের অভাব নেই। কেরামত মিয়ার হোটেলের তেলের কেরামতিতে জিহ্বা আরাম পায় বটে তবে কিছু লোকের হৃদয় বিদ্রোহ করে বসেছে। পেঁয়াজের আড়ৎদার রসু বেপারী এই হোটেলে তিন বেলা পদধূলি দিত। তার বউ সারাজীবন কেরামত বাবুর্চিকে হিংসা করত, স্বামীকে খাইয়ে কোনোদিন খুশি করতে পারেনি সে। বউ কত বুঝাত—

ঐ তেলতেইল্যা খাওন খাইও না।

কিন্তু রসু বেপারী কান দিত না। কান না দিলেও প্রাণটা দিতে হয়েছিল। হার্টে দুইটা ব্লক ধরা পড়েছিল, ডাক্তার তার নাতির গা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করাল যেন আর বাহিরের খাবার না খায়। শুধু শাকসবজি খায়। রসু বেপারী এক বেলা খেল, তারপর বলল—

আমি কি গরু নাকি ছাগল, এই ঘাসটাস আমি খাইতে পারুম না।

দুই মাস পরেই কেরামত হোটেলে সকালে খাসির তেহারি খেয়ে ঢেকুর দিয়েই চোখ উল্টে পড়ে গেল বেপারী। মৃত্যুর সময়েও তার মুখে সেই তৃপ্তির ঢেকুর লেগে ছিল।

এই অঞ্চলের মানুষ মৃত্যুকে যতটা ভয় পায় খাবারকে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসে। সব বাঁধা খদ্দেররা অবশ্য কেরামত মিয়ার রান্নার প্রেমে মত্ত না। মানিকের আর কোনো উপায় নেই, ঘরে রান্না করার মতো কেউ নেই। একই কারণে বিয়ে করা হয়নি। পাত্র হিসেবে সে প্রথম শ্রেণির কিন্তু তবুও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা পিছুটান দিচ্ছেন শুধুমাত্র একটা কারণে। সে কারণটা প্রতিমুহূর্তে মানিকের মনে সুচের মতো বিঁধতে থাকে, রক্তাক্ত করতে থাকে তাকে।

মানিকের মতো নারায়ণ বাবুও কেরামতের গুণমুগ্ধ নয় কিন্তু সকালবেলা লাইন ধরে সবজি-ভাজি কিনতে আসেন। নারায়ণ বাবু ছাড়া কেউ শুধু ভাজি কিনতে আসে না। নারায়ণ বাবু যুদ্ধের বছরে কলকাতা চলে গিয়েছিলেন সপরিবারে : বছর পাঁচেক আগে ফিরে এসেছেন। তিনি সেসব ভাগ্যবান মানুষদের একজন যার বাড়ি দখল হয়ে যায়নি। কলকাতা থেকে ওজন কমিয়ে দেশে ফিরলেন, সাথে নিয়ে আসলেন কলকাতার কিপ্টেমি। কেরামত মিয়ার ভাজির তেলে গিন্নীকে দিয়ে দুপুর এবং রাতের রান্নাটা সারিয়ে নেন।

বদরুল সাহেব নাক-মুখ কুঁচকে কেরামতের হোটেলে বসে আছেন, তার মুখে বয়সের ভাঁজের সাথে সাথে বিরক্তির ভাঁজও ফুটে উঠেছে। মানুষজন খাওয়ার সময় উচ্ছিষ্ট সব টেবিলে স্তূপ করে জমা করছে, প্রত্যেক টেবিলে মাংসের হাঁড় দিয়ে ছোট ছোট টিলা বানানো হয়েছে, কোনো কোনো টেবিলে তা রীতিমতো পর্বত। মেসিয়ার নামক চটপটে এবং পটপটে মানুষগুলো হনুমানের মতো সেই গান্ধব পর্বত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হোটেলের সামনে গোটা দুই কুকুর সেই হাঁড়ের পর্বতের লোভে অনবরত চিৎকার করে যাচ্ছে।

হোটেলের ভেতরে সবাই উচ্চস্বরে কথা বলছে, হোটেলের মালিক বাবুর্চি কেরামত মিয়া মেসিয়ারদের বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করছেন। একজন মেসিয়ার রান্নাঘর থেকে কিছু মাংসের হাড় এনে কুকুরগুলোকে দিল। অভুক্ত কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল হাড়ের উপর।

তারা যখন মনোযোগ দিয়ে হাড় চিবুচ্ছিল তখন সেই মেসিয়ার এক গামলা গরম পানি ঢেলে দিল কুকুরগুলোর উপর। কুকুর দুটো 'ক্যাক ক্যাক' করে চিকন স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। কেরামত মিয়া খুব মজা পেয়েছে এই দৃশ্য দেখে, খ্যাক খ্যাক করে হাসছে। বদরুল আলম এই দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠলেন। তিনি মানিকের দিকে তাকিয়ে বললেন—

হাউ ক্রুয়েল দে আর। ইম্পসিবল, আমি এখানে খাব না।

মানিক বলল—

স্যার পৃথিবীটাই নিষ্ঠুর, আমাদের হাসপাতালে এর চেয়েও নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে। অনেক মানুষ আপনাকেও নিষ্ঠুর বলে, আমাকেও বলে। ডাক্তার মানেই নিষ্ঠুর। আমরা মৃত্যু দেখে বিচলিত হই না তাই আমরা পাষাণ। নিষ্ঠুর শব্দটাই আপেক্ষিক স্যার।

বদরুল সাহেব কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কাউন্টার থেকে চেঁচামেচি শোনা গেল। কেরামত মিয়া এক বয়স্ক লোককে নিজের বগলে চেপে ধরেছে। রান্নাঘর থেকে গরম পানি আনতে বলছে মেসিয়ারকে। লোকটি বিশালদেহী কেরামত মিয়ার বগলে ধড়ফড় করছে, ছুটে যেতে চাচ্ছে। লোকটার গায়ের ময়লা জামাটা আগেই ছেঁড়া ছিল, ধস্তাধস্তিতে সেটা আরো ছিঁড়ে গেল। লোকটার মুখ লাল হয়ে গেছে, একটু আগে গরম পানিতে পশম হারানো কুকুর দুটি দূর থেকে তাকিয়ে আছে আর কুঁই কুঁই শব্দ করছে....

তাদের একটি মানব সঙ্গী জুটবে মনে হচ্ছে। মানিক উঠে গিয়ে কেরামতকে জিজ্ঞাসা করল—

কী হয়েছে ভাই?

কেরামত মিয়া বগলের বাঁধন আরো শক্ত করে বলল—

মাগীর পুতে দাঁত খিলাইতে খিলাইতে বিল না দিয়া নবাবের পাহান হাইটা চইল্যা যাইতাছিল, মনে করছে চোখ দুইডা আমি পুন্দে দিয়া বয়া রইছি।

মানিক জিজ্ঞাসা করল—

আচ্ছা বিল কত হয়েছে, আমি দিয়ে দিব।

কেরামত মিয়ার রাগ মনে হয় একটু কমেছে, মানিক তার অসুস্থ বউকে মাঝে মাঝেই দেখে আসে। মানিককে সে শ্রদ্ধা করে, তার সামনে মুখ খারাপ করেছে সে জন্য তার অনুশোচনা হয়, সব সময়ই হয় কিন্তু রাগ উঠলে আর মনে থাকে না। সে মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল—

আপনের দেয়া লাগব না।

তারপর বয়স্ক লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল—

বুড়া মিয়া তুমি কামডা ঠিক করো নাই, পয়সা না থাকলে কইবা। কেউ আইসা কইছে ভুক লাগছে আর আমি খাওয়াই নাই এমন হয় নাই। কিন্তু চুরি কইরা খাইলে মাফ নাই। তুমি এহন থেইকা যহন খুশি আইয়া খাইয়া যাইবা, পয়সা লাগব না।

বয়স্ক লোকটি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, সে মানিকের দিকে লজ্জিতভাবে তাকাল তার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছিল। মানিক চলে আসল, কৃতজ্ঞ দৃষ্টির সামনে বেশিক্ষণ থাকা যায় না, অস্বস্তি লাগে, মনে অহংকার চলে আসে।

বদরুল সাহেব সব দেখছিলেন। মানিককে বললেন—

একটু আগেই লোকটিকে কী নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল, এখন তা মনে হচ্ছে না, এখানে খাওয়া যায়। আচ্ছা বয়স্ক লোকটিকে কি তুমি চিনো?

না স্যার, তবে হতেও পারে তিনি আমার আপনজন।

কীভাবে?

মানিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—

স্যার আমি অনাথ, ঢাকা অনাথ আশ্রমে বড় হয়েছি। বাবা-মায়ের কোনো পরিচয় জানি না। তাই সব মানুষকেই আমার আপন মনে হয়। এই লোকটিই হয়তো আমার বাবা। সব বয়স্ক লোককেই আমার বাবা মনে হয়।

বদরুল সাহেবের চোখে কেমন যেন একটা বেদনা ফুটে উঠল। তিনি নিজেকে সামলে বললেন—

তোমার নামটা যেন কী, ভুলে গেছি।

স্যার, মানিক মিত্র।

তুমি কি সোবহান সাহেবের আন্ডারে আছ?

জি স্যার।

তুমি কি সোবহান সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা দিয়েছ?

জ্বি স্যার।

কী সর্বনাশ! তুমি কি জানো তোমার চাকরি চলে যাবে? রেজিস্ট্রেশনও ক্যান্সেল হতে পারে।

কেন স্যার, আমি তো অন্যায় করিনি। সোবহান স্যার যেভাবে সেই বাচ্চা মেয়েটিকে এক্সামিন করছিলেন, সেটাকে ধর্ষণের পর্যায়ে ফেলা যায়। তাছাড়া এই হসপিটালে অনেক নার্স এবং মেয়ে ডাক্তাররা উনার সম্পর্কে জানে। কেউ ভয়ে অভিযোগ করে না।

বদরুল সাহেব বললেন—

কেউ করে না এবং করবেও না। কেউ তোমার পক্ষে সাক্ষীও দিবে না। উলটো তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। তুমি জানো না, সোবহান সাহেব প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেবের বন্ধু মানুষ। স্বাস্থ্য সচিব তাকে স্যার বলে ডাকে। বয়সের কারণে সে পরিচালক হতে পারেনি—

আর কয়েক দিন পরেই সে পরিচালক হবে। এক কাজ করো, তুমি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও।

মানিক বলল—

আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি স্যার, আমাকে এমন কিছু করতে বলবেন না যেটা আমি করতে পারব না। আমার কিছু নেই তাই হারানোর ভয়ও পাই না। আমার যা হওয়ার হবে, দেখা যাবে।

একটু থেমে বলল—

স্যার কাচ্চিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে ভালো লাগবে না।

বদরুল সাহেব তাকিয়ে দেখলেন তৈলাক্ত একটা খাবার তার সামনে, এটা খাওয়া ঠিক হবে না, বুঝতে পারছেন কিন্তু ক্ষুধাও লেগেছে। একটু মুখে দিয়েই তার কুঁচকানো মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বেশ খানিকটা খেয়ে বললেন—

চমৎকার রান্না করেছে। তাই তো বলি, এত বারণ করার পরও কেন রোগীরা এসব খাবার ছাড়তে পারে না। আমার এক রোগীকে তার নাতির মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলাম কিন্তু সে শোনেনি। লোকটার নাম ছিল রসু বেপারী, বিরাট আড়তদার।

মানিক একটু হেসে বলল—

স্যার রসু বেপারী এই হোটেলেই মারা গিয়েছিল তেহারি খেয়ে।

বদরুল আলম খাওয়া বন্ধ করে হাঁ করে মানিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন, রসু বেপারীর যন্ত্রণাকাতর মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই যন্ত্রণার ছাপ কিছুটা তার নিজের চেহারায়ও পড়ল। মুখ নামিয়ে কাচ্চির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর পাশ দিয়ে যাওয়া মেসিয়ারকে বললেন—

আরেক প্লেট দিও তো।

স্বাদের কাছে মৃত্যুভয় পরাজিত হলো।

মানিক আর বদরুল সাহেব বের হয়ে দেখলেন, গরম পানিতে পশম হারানো কুকুর দুটিকে উচ্ছিষ্ট এনে দেয়া হয়েছে। কেরামত মিয়ার মন আষাঢ়ের আকাশের মতো, এই রোদের তেজ তো এই বৃষ্টির কোমল পরশ।

বদরুল সাহেব মানিকের দিকে তাকিয়ে বললেন—

বয়স্ক লোক দেখলেই তোমার বাবার মতো মনে হয়, আমাকে কি তোমার বাবার মতো মনে হয়?

মানিক বলল—

না স্যার, অনাথদের বাবা হয় মৃত, দরিদ্র, অসহায় অথবা অপরাধী। আপনি তার কোনোটা নন।

বদরুল সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—

তুমি বলেছিলে, মানুষের মৃত্যুতে ডাক্তাররা বিচলিত হয় না। কথাটা ঠিক নয়। আমরা বিচলিত হই কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখের খবর আমরাই দেই, মানুষের জন্মের সময়। আবার সবচেয়ে কষ্টের কথা আমাদেরই শোনাতে হয়, মানুষের মৃত্যুর খবর। আমরা বিচলিত হলে এই কাজ করতে পারতাম না। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ করেছি, আমার স্ত্রীকে আমার ছেলের মৃত্যুর খবর দিয়েছি।

আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি, হয়তো কোথাও আটকে যাচ্ছিল। হাঁটতে লাগলেন তিনি, বিদায়ও নিলেন না। মানিক দেখল এক পৃথিবী সমান কষ্টের বোঝা নিয়ে এক বৃদ্ধ কত স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাচ্ছে।

বংশালে গেট দেয়া দেয়াল ঘেরা একটা বাড়িতে থাকে মানিক। একতলা টিনের চালের বাড়ি, সামনে বারান্দা। উঠানের এক কোণে বাঁধানো কলপাড়, তার পাশেই রান্নাঘর। উঠানের ঠিক মাঝামাঝিতে একটি বরই গাছ। এই বাড়িতে মানিক একা থাকে, অথচ এককালে এখানে একটা সুখী পরিবার থাকত। বাড়ির পেছনে গিন্নীর লাগানো হাসনাহেনা গাছ এখনো রাতে মাতাল করা গন্ধ ছড়ায়। বরই গাছের কাণ্ডে বাড়ির ছোট্ট ছেলেটির স্বাক্ষর আজও মুছে যায়নি। কর্তার ইজি চেয়ারের দাগ বারান্দার মেঝেতে রয়ে গেছে।

কাপড় শুকানোর জন্য আড়াআড়িভাবে বাঁধা নাইলনের দড়িটি এখনো বাঁধা আছে, সেই দড়িটি বড় অলস সময় কাটাচ্ছে। দড়িতে ঝোলানো কাপড় দেখলেই যে কেউ বলতে পারত এখানে বাবা-মা ভাই-বোনের সুখের সংসার।

ডা. সুধীর দত্ত বংশালে এই বাড়িতে তার সংসার পেতেছিলেন। কত স্বপ্ন দেখতেন বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে, পত্রিকা পড়তে পড়তে আবার ঘুমিয়েও যেতেন। ঘুমিয়েও সেই একই স্বপ্ন দেখতেন। মেয়েটিকে একটি ভালো ছেলে দেখে পাত্রস্থ করবেন। ছেলেটিকে স্কলারশিপে বিদেশে পাঠাবেন। বুড়ো-বুড়ি নাতি-নাতনিদের সাথে গল্প করবেন আরো কত কী। বউয়ের চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙত কিন্তু স্বপ্ন ভাঙত না। কলপাড়ে বসে মাছ কাটতে কাটতে অভিযোগের ঝাঁপি খুলে বসত গিন্নী। কর্তার বাজার জ্ঞান বরাবরই কাঁচা।

বিশ বছর ধরে বাজার করেও নিয়মিত ঠকে যাচ্ছেন। সুধীর বাবু ইজি চেয়ারে শুয়েই তার মেয়েকে ডাকেন—

কই গো মা আমার। বাবার জন্য এক কাপ চা নিয়ে আয় তো। তোর হাতে চা না খেয়ে যাই কী করে বল?

সুধীর বাবুর মেয়ে হাতে একটা লিস্ট এনে বাবার হাতে ধরিয়ে দেয়। বলে—

বাবা এই বইগুলো এনে দিও তো।

সুধীর বাবু আদুরে গলায় বলে—

মাগো, এই বয়সে মেয়েরা সাজগোজের জিনিসের জন্য আবদার করে, তোকে তো দেখলাম না কোনোদিন লাল ফিতা কিংবা নতুন ফ্যাশনের জামা চেয়েছিস!

মেয়ে বলে—

সবাই নিজেকে সাজায় আমি আমার মনকে সাজাই।

সুধীর বাবুর বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে। তিনি বলেন—

বুঝলি মা, আশ্রমে একটা ছেলে আছে মানিক নাম। একেবারে গোবরে পদ্ম ফুল, ব্রিলিয়্যান্ট বয়। একদিন নিয়ে আসব। ম্যাট্রিকটা পাস করলেই বাসায় নিয়ে আসব। খোকনকে পড়াবে।

খোকনকে পড়ানো হয়নি মানিকের। তার আগেই একাত্তর এসে গিয়েছিল। দুইটি বেয়নেটের সামনে বসে সুধীর বাবু দেখছিলেন কীভাবে তার জীবন থেকে স্বপ্নগুলোকে টেনেহিচড়ে খাবলে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল পশুরা। ঘর থেকে তার মেয়ের চাপা চিৎকার ভেসে আসছিল, মেয়েটা বারবার বাবা বাবা বলে চিৎকার করছিল। অসহায় সুধীর বাবু নিজের মাথা ঠুকছিলেন। তার বউ রান্নাঘরের পাশে শুয়ে গোঙাচ্ছিল, বুকের ভেতর বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো হয়েছে তাকে। রক্তের প্রবাহ এঁকেবেঁকে মাটিতে গড়িয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুর আগে সুধীর বাবুর দিকে তাকিয়ে ছিল তার বউ, তার চোখে তীব্র বেদনা ছিল, নিজের মৃত্যুর বেদনা নয়, মেয়ের সম্ভ্রম, খোকনের প্রাণের আশঙ্কায়। খোকন বরই গাছে উঠে বাঁচতে চেয়েছিল, তাই দেখে হাসছিল জানোয়ারগুলো। সুধীরবাবু চিৎকার করে বলছিলেন—

সে বাচ্চা ছেলে, ওকে ছেড়ে দাও। সে কিছু করেনি।

তারা কেউই কিছু করেনি, একমাত্র অপরাধ তারা হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়েছিল। সেটা কীভাবে তাদের অপরাধ হলো, সুধীর বাবু কিছুতেই বুঝতে পারে না। এক বাঙালি দালাল বলে উঠল—

হিন্দুর পোলা হিন্দু হইবো। ইন্ডিয়ায় দালালি করবো।

বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে নামানোর চেষ্টা করছিল এক উর্দি পরা পাকি জানোয়ার। কিন্তু গাছের ডাল উঁচু হওয়ায় নাগাল পাচ্ছিল না। একটা হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছিল, খ্যাক খ্যাক করে হাসছিল বাঙালি জানোয়ারটি। খোকন আঁকড়ে ছিল গাছটি, ভয় পেলে যেভাবে মাকে আঁকড়ে ধরে সেভাবে।

মোটা গোঁফওয়ালা পাঞ্জাবি কমান্ডার ঘর থেকে নিজের শার্ট পরতে পরতে বের হলো, আরেকজন ঢুকবে ঘরে কিন্তু এই মজার দৃশ্য ফেলে সে যেতেও পারছে না। পাঞ্জাবি কমান্ডার এসে বললেন—

ইতনা কঞ্জুসি মাত কারো, এক গোলি কা হি তো মামলা হ্যায়।

একজন সৈন্য উৎসাহী হয়ে বন্দুক তাক করে গুলি করল। সাথে সাথেই খোকনের হাতের বাঁধন খুলে গেল। বরই গাছের নিচে তার শরীরটা একবার ভীষণভাবে মুচড়ে উঠে নিথর হয়ে গেল। গাছের নিচে রক্তের একটা গোল বৃত্ত তৈরি হলো। ঘরে ঢোকা সৈন্যটি রাগতে রাগতে বের হয়ে বলল—

কমবখত ল্যারকি ফাঁস লে লি। রেন্ডি কাহি কা।

তার ভোগ না মিটিয়ে মরায় সে খুব ক্ষুব্ধ। সুধীর বাবু মূর্ছা গেলেন।

পাকিস্তানিরা সুধীর বাবুকে ছেড়ে দিয়েছিল। কমান্ডার বলেছিল—

ইয়ে বুড্ডা অউর পেয়দা নেহি কার সাকতা। ইস্কো ছোড় দো।

সেদিন যদি পাকিস্তানিরা তাকে মেরে ফেলত তবে সুধীর দত্ত বেঁচে যেত। সেদিনের পর থেকে তিনি প্রতিদিন মৃত্যু কামনা করেন। জীবন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, মৃত্যুও।

সেদিনের পর থেকে কখনো নিজের ঘরে ঢুকেননি সুধীর বাবু, বারান্দায় থাকতেন। ম্যাট্রিকের পর মানিককে নিয়ে এসেছিলেন। বৃষ্টির রাতে বারান্দায় বসে বসে ভিজতেন কিন্তু ঘরে যেতেন না। মানিক অনুরোধ করলে বলতেন—

ঘরে যাব না রে মানিক, ঐ ঘর থেকে আমার মেয়ের চিৎকার শুনি আমি। বাবা বাবা বলে ডাকে। আমি কিছুই করতে পারি না।

মানিকের মনে হয় সুধীর বাবু কাঁদছে কিন্তু বুঝতে পারে না, বৃষ্টিতে চোখের পানি আলাদা করা যায় না। উঠানে তিনি জমাট বাঁধা রক্তের কালো দাগ দেখতে পান, মানিককে ডেকে বলতেন—

দেখ তো বরই গাছের নিচে কালো হয়ে আছে না?

মানিক কিছুই দেখত না। প্রতিদিন বেশ কয়েকবার সুধীর বাবু উঠানে পানি ছিটিয়ে নিতেন। কিন্তু তবুও সন্তুষ্ট হতেন না। যত দিন যায় তিনি তত কালো দাগ দেখতে পান আর তত পানি ছিটান। কয়েক বছর পরে মানিক যখন ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি হলো, তখন একদিন সুধীর বাবু বলল—

আমি চলে যাব রে, এই মাটির লোভে দেশ ছাড়িনি, সব হারিয়েছি। কিন্তু আজ এই মাটি কালো হয়ে যাচ্ছে রে। আমি এখানে থাকব না। তোকে সব দিয়ে গেলাম। কাগজপত্র করেই দিলাম। এমনি এমনি দিচ্ছি না, বাকি থাকল, ডাক্তার হয়ে দেনা শোধ করবি। কলকাতায় আমার আত্মীয়স্বজন আছে। সেখানে গিয়ে থাকব, ভালো না লাগলে আবার চলে আসব। তখন যেন আবার আমায় তাড়িয়ে দিস না।

মানিক মনে মনে বলল, আপনার দেনা শোধ করার মতো ক্ষমতা আমার কোনোদিনই হবে না।

মাটি ছেড়ে যেতে পারেনি সুধীর দত্ত। যেদিন কলকাতায় রওনা হওয়ার কথা তার আগের দিন বারান্দায় ইজি চেয়ারটাতে শোয়া অবস্থায় সুধীর দত্ত মারা গেলেন। তার অপেক্ষার অবসান হলো।

সেই ইজি চেয়ারটাতে কখনো বসে না মানিক। এই বাড়ি এখন তার, কিন্তু একবারের জন্যও তার সেটা মনে হয় না। নিস্তব্ধ বাড়িটাতে ঢুকলে বুকটা হু হু করে ওঠে, এই বাড়ির মতোই মানিক একা, সব হারিয়েছে তারা। অবশ্য হারানোর মতো কিছু ছিলও না মানিকের।

পাশের বাসায় শাশুড়ি আর বউয়ে বাকবিতণ্ডা হচ্ছে, প্রায়ই হয়। স্বামীটি একেবারে চুপচাপ, বউ স্বামীর সাথে ঝগড়া করে মজা পায় না, তাই শাশুড়িই ভরসা। আরেক বাসায় দুই ভাই-বোন গলা উঁচু করে পড়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তাদের এই প্রতিযোগিতায় আশেপাশের মানুষদের তাদের পড়া মুখস্থ হয়ে যায়। আশেপাশের

বাসাগুলোতে একটু পরে বাবারা আসে। কোনো বাসায় বাবারা আসলে চিৎকার চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে যায়, আবার কোনো বাসায় শুরু হয়। খোশগল্প অথবা ঝগড়া হয় কোথাও। মনোযোগ দিয়ে শুনে মানিক। মাঝে মাঝে সব ছাপিয়ে যায় বৃদ্ধের কাশি। হাঁড়ি-পাতিলের সাথে চামচের ঠুকাঠুকি শুরু হয় একটু পর, কোলাহলটা কমে যায় একটু তখন। মানিকের মনে পড়ে তাকে খাওয়ার জন্য হোটেলে যেতে হবে।

আশেপাশের কোলাহল এই বাড়িটাকে আরো নীরব করে দেয়। সব বাড়ি কথা বলে, এই বাড়ি বোবা। মানিক পরিবার পায়নি, প্রতিবেশীও না। সে চেষ্টা করত একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়তে, কিন্তু পারত না। বৃদ্ধকে দেখে কতবার মনে হয়েছে জিজ্ঞাসা করবে, কাশিটা কমেছে কি না, কিন্তু করতে পারে না। শাশুড়ীটাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, তাদের ঝগড়া এখন বন্ধ কেন, বউ কি বাপের বাড়ি গেছে? পাশের বাসার ভাবিকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, তার বাবুটা কেমন আছে? পারে না, কী যেন একটা সঙ্কোচ তাকে ঘিরে ধরে। সে খেয়াল করেছে, যে নারীর অনেক ভাই সে আরো ভাই পাতাবে। যার বোন আছে সে আরো অনেককে বোন ডাকবে। তার কিছুই নেই, তাই সে কাউকে কিছু বানাতে পারে না। সে সবাইকে আপন ভাবে, তাই কাউকেই আপন করে নিতে পারে না। নারায়ণ বাবুর বউ ঘরে মেহমান এলেই আশেপাশের বাসায় চায়ের পাতা, দুধ, চিনি চাইতে আসেন। অনেকেই এখন আর দেয় না। মানিক চা খায় না তবুও সে চায়ের পাতা, দুধ, চিনি এনে রেখেছে। কোনোদিন যদি বৌদি আসে তবে সে নিঃসঙ্কোচে দিবে। কিন্তু নারায়ণ বাবুর বউ সব ঘরে যায়, তার ঘরে আসে না। একুশে ফেব্রুয়ারির আগের দিন গেট খুলে রাখে যাতে বাচ্চারা ফুল নিতে পারে কিন্তু তার বাসা থেকে ফুল চুরি করতে আসে না কেউ, এরকম গেট খুলে আহ্বান জানালে সেটা ঠিক চুরির মর্যাদা পায় না, তাই হয়তো।

মানিক ওয়ার্ডে ডিউটি করছিল। ওয়ার্ড বয় মনসুর গোমড়া মুখে এসে বলল—

স্যার আপনেরে ডাইরক্টর সাব বুলায়।

মনসুরের গোমড়া মুখ খুব দুর্লভ বস্তু। ভয়ানক বিপর্যয়ের খবরও সে হাসিমুখে দেয়। একবার ঠোঁট প্রসারিত করে হাসতে হাসতে বলল, স্যার তিন নম্বর বেডের রোগী মইরা গেছে।

তারপর আরেকটা লাজুক হাসি দিয়ে বলল, রোগী কালা সেলিমের আত্মীয় আছিল, তারা হাসপাতাল ভাংচুর করতাছে।

সেই মনসুর যখন গোমড়া মুখে কোনো খবর দেয় তখন সেটা কত খারাপ খবর সেটা ধারণাও করা যায় না।

নিজের চেম্বারে বসে আছেন ডা. বদরুল আলম। বিশাল চেয়ারটির কারণে তাকে ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে। চেয়ার যত বড় হবে মানুষ তত ক্ষুদ্র হবে। বদরুল আলম সামনে ঝুঁকে মানিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি জানো, এই হসপিটালে সবাই তোমাকে কত ভালোবাসে, এমনকি মনসুরও? সে বলেছে তোমার চাকরি চলে গেলে সেও চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে যাবে, বলদের সাথে মিলে জমিতে হাল দিবে। সোবহান সাহেব ভয় দেখিয়ে একজন নার্সকেও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজি করাতে পারেননি।

নার্স নাসরিনকে চিনো? তার দুই বছরের বাচ্চা আছে, ঘরে মা আছে, এক ভাই আছে কিন্তু স্বামী নেই। এই চাকরি গেলে হয় ভিক্ষা করতে হবে নয়তো নিজেকে বিক্রি করতে হবে। সেও বলেছে, চাকরি গেলে যাবে কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবে না।

মানিক মাথা নিচু করে রইল, এতো ভালোবাসা তার আশেপাশেই ছিল, সে খুঁজে পায়নি, শুধু হাতড়ে বেড়িয়েছে। আবেগে বুঝি তার চোখটা একটু ভিজে উঠল।

বদরুল আলম বললেন,

কিন্তু আমরা যেহেতু মগের মুল্লুকে বাস করি তাই ক্ষমতাবানরা তোমার লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। তোমাকে বান্দরবানের থানচি উপজেলায় পোস্টিং দেয়া হয়েছে। খুব সম্ভবত তোমাকে ইউনিয়ন সাবসেন্টারে পাঠাবে। আমার কাছে এই শাস্তি টা লঘু মনে হয়নি—পাহাড়ের অবস্থা এখন ভালো না। পত্রিকা খুললেই দেখি খুন, সংঘর্ষ, অপহরণ।

একটু থেমে বদরুল আলম বললেন—

তবে সুখবর হলো থানচিতে আমার এক বাল্যবন্ধু আছে, সেখানে কী যেন একটা এনজিও চালায়। আমি তাকে চিঠি লিখে দিব, তোমার সব ব্যবস্থা সে করবে।

মানিক বুঝতে পারল না নিজের মনের অবস্থা। তার কোনো আক্ষেপ হলো না, আবার উচ্ছ্বসিতও হলো না। সে বদরুল আলমের দিকে তাকিয়ে বলল—

ধন্যবাদ স্যার।

বলেই মানিক উঠল। বদরুল আলম বললেন—

মানিক সাবধানে থেকো।

এই কথাটা বলার সময় বদরুল আলমের গলাটা একটু কেঁপে উঠল। মানিক দেখল বদরুল আলমকে আর পিজি হাসপাতালের হামবড়া পরিচালক মনে হচ্ছে না। এই প্রথম তাকে বাবার মতো লাগছে। কিন্তু এই কথাটা সে কখনোই বদরুল আলমকে বলতে পারবে না। তার বুকে ভালোবাসার আগ্নেয়গিরি আছে কিন্তু কখনোই তার উদ্গীরণ হয় না।

মানিক ঢাকা অনাথ আশ্রমের তত্ত্বাবধায়কের ঘরে বসে আছে। ছোট্ট একটা ঘর। এলোমেলোভাবে কাগজপত্র ছড়ানো। দুটি কাঠের চেয়ার আছে বসার জন্য, সেই চেয়ারগুলোতে ঘুণপোকারা আশ্রম খুলে বসেছে। জানালাতে পাতলা ময়লা একটা পর্দা দড়ি দিয়ে ঝুলানো হয়েছে, দড়িটি ঢিলে হয়ে যাওয়ায় পর্দাটি উপরের দিকে বাঁকা চাঁদের মতো ঝুলে আছে। দেয়ালে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা রানি রাশমণির একটা সাদাকালো পোর্ট্রেট আছে, রানি রাশমণি স্বয়ং দেয়ালে ঝুলেও এই ঘরটার শ্রী বৃদ্ধি করতে পারেননি। রানির পাশেই একটি পত্রিকার কাটিং বাঁধিয়ে টাঙানো হয়েছে। পত্রিকার কাটিংয়ে সাদাকালো ছবি, নিচে লেখা অনাথ আশ্রমের শিক্ষকদের সাথে ঢাকা বোর্ডে চতুর্থ হওয়া মেধাবী মানিক মিত্র। কিন্তু ছবিতে মানিককে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারো দৃষ্টিশক্তি প্রখর হলে দেখতে পাবে, শিক্ষকদের আড়ালে ছোট্ট একটা মুখ দেখা যায়। ছবি তোলার সময় চণ্ডীদাস বাবু মানিককে ঠেলে নিজেই মধ্যমণি হয়ে

বসেছিলেন, গায়ে-মুখে কেজি খানেক পাউডার মেখে মাথায় চপচপে তেল দিয়ে সরু সিঁথি করে চুল আঁচড়ে এসেছিলেন তিনি। বিয়ের সময়ও বোধ হয় তিনি এত সাজেননি। সাজবেনই বা না কেন, আজকাল না মরলে তো আর অত সহজে পত্রিকায় ছবি ওঠানো যায় না।

এই চণ্ডীদাস বাবুই সুধীর দত্তকে মানিকের সামনেই বলেছিলেন,

আপনে মশায় যত বড় ডাক্তারই হন না কেন, বুদ্ধিশুদ্ধি আপনার একটু কমই। এই আশ্রমের ছেলেকে কেউ গাটের পয়সা খরচ করে দামি স্কুলে ভর্তি করায়? আপনি সপ্তাহে দু'দিন এসে যে বাচ্চাদের কে বিনে পয়সায় দেখে যান, তাই বা কম কি! স্বর্গে তো জায়গা তাতেই পাকা হয়ে গেছে। এই আশ্রমের ছেলেপেলে লেখাপড়া শিখে করবেটাই কী? দোকানের কর্মচারী হবে, হোটেলে ধোয়া-মোছা করবে, মেকানিক হবে নয়তো জেল খাটবে। ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলেই নামটা পাল্টে দিবেন আমার।

চণ্ডীদাস বাবুর নাম ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার নামখানা বহাল তবিয়তেই ছিল। সুধীর বাবু সে কথা আর তুলেননি, চণ্ডীদাস বাবু তো তুলবেনই না, নিজের নামখানা অতিপ্রিয় তার।

ঢাকা অনাথ আশ্রমের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক চন্দন বাবু ঘরে ঢুকলেন। মাথায় এখনো ঝাঁকড়া চুল, সব সাদা হয়ে গেছে। ত্রিশ বছর ধরে এই আশ্রমে কাজ করছেন। মানিককে নামতা শিখিয়েছেন তিনি। মানিক মাত্র সাত বছর বয়সে উনত্রিশের নামতা বলে সুধীর বাবুকে অবাক করে দিয়েছিল। চন্দন বাবু অবাক হতেন না, তিনি সুধীর বাবুকে বলতেন—

এই ছেলে কাঁচা সোনা, সুধীর বাবু একে আপনি আকার দিন।

মানিক উঠে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। মানিক যতবার তাঁর পা ছোঁয় ততবার তিনি বিব্রত হন কিন্তু বুকটা যেন ফুলে ওঠে। কত বড় ডাক্তার তার মতো স্বল্পশিক্ষিতকে গুরু মেনে পা ছোঁয়। চন্দন বাবু বলেন—

কেন আমাকে লজ্জা দাও মানিক। আমি সামান্য মানুষ, বাচ্চাদের দেখাশুনা করি, বিনিময়ে টাকা নিই, কোনো ভালো কাজ তো করছি না। তোমরা ভালো কাজ করছ, তোমাদের মতো মানুষের দানেই এই আশ্রম চলে, আমরা চলি।

মানিক হেসে বলল—

আপনি আমার গুরু। গুরুকে সম্মান দেয়ার শিক্ষা আপনিই দিয়েছেন। আর দানের কথা বলছেন? আমার সব কিছুই তো দানে পাওয়া। ঠিকানা পেয়েছি দানে, নাম পেয়েছি দানে, পরিচয়টাও দানে পাওয়া। আমি যতই দিব এর প্রতিদান দেয়া হবে না।

চন্দন বাবু আবেগী হয়ে গেলেন, বললেন—

ওভাবে বলো না বাবা। তোমার পরিচয় তুমি নিজেই।

মানিকের চোখে বেদনা ফুটে উঠল। আকুতি নিয়ে বলল—

সেটা তো মানুষের কাছে, আমি তো বাবা-মার জন্য প্রার্থনাও করতে পারি না। আমি জানিই না তারা বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—

মাস্টার মশাই আমার ট্রান্সফার হয়েছে, বান্দরবানে। আগামী মাস থেকে আমি মানি অর্ডার পাঠাব। পোস্টম্যানটাকে বলে রাখবেন।

প্রণাম করে উঠে গেল মানিক। চন্দন বাবু মানিকের চলে যাওয়া দেখছিলেন। মনে মনে ভাবলেন, ছেলেটা নিজের পরিচয়ের জন্য ক্ষুদিত হয়ে ঘুরছে কিন্তু সেই পরিচয় তার মনের ক্ষুধা মেটাবে না, বেদনা বাড়াবে, ঘৃণা বাড়াবে।

খুব ছোটবেলায় মানিকের মনে মায়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, প্রয়োজনও না। সে বুঝতে শেখার পর থেকেই নিজেকে আশ্রমে আবিষ্কার করেছে। সেখানে নিয়ম ছিল, শৃঙ্খলা ছিল কিন্তু মায়ের আদর সেখানে দেয়াল ডিঙ্গিয়ে অনুপ্রবেশ করতে পারত না।

সেখানে আবদার ছিল না, অভিমান ছিল না। তাদেরকে কৃতজ্ঞ হওয়া শেখাত মাসিদের চোখ আর আয়াদের কটু কথা। সেখানে কেউ মাকে ডেকে কাঁদতে শিখেনি, বাবার কাঁধে চড়ে খিলখিল হাসির অস্তিত্ব কেউ জানতও না।

মা এসেছিল একদিন কালো শ্লেটে। 'ম'-এর সাথে 'আ' কার দিয়ে মা হয়েছিল। সাদা শব্দটি জ্বলজ্বল করছিল। সে মাসিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—

মাসি আমার মা কোথায়?

মাসি বলেছিল—

তোর মা নাই বাবা নাই, মারা গেছে।

বাবা-মায়ের মৃত্যু সংবাদে সে কোনো কষ্ট পেল না, কারণ আগে তাদের কোনো অস্তিত্ব ছিলই না। সে জিজ্ঞাসা করল—

আমার বাবা-মা কে?

মাসি মুখস্থ বলে দিয়েছিলেন—

তোর বাপের নাম কৃষ্ণ কুমার মিত্র, আর মার নাম লক্ষীরানী মিত্র।

মানিক মুখস্থ করে নিয়েছিল। মাঝে মাঝেই নিজের মনে আওড়াত নাম দুটি। তার কাছে মা ছিল কিছু ব্যঞ্জনবর্ণের সমাহার। একদিন আশ্রমে 'মা' ডাক শুনতে পেল তারা। মানিক নিজের ঘর ছেড়ে মাস্টার মশাইদের ঘরে উঁকি দিল। তার বয়সী একটা ছেলে একজন মহিলার আঁচল ধরে চিৎকার করে 'মা মা' ডাকছে। যার আঁচল ধরেছে সে ই বুঝি মা। মানিক দেখল মহিলাটি ছেলেটিকে টেনে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তার মুখে কি আশ্চর্য এক মায়া আর কী গভীর বেদনা। মাসিদের মুখ তো অমন হয় না,

আয়ারাও অমন করে জড়িয়ে ধরে কাঁদে না কখনো। ছেলেটার প্রতি হিংসায় মন ভরে গেল তার। ছেলেটার নাম ছিল কার্তিক। কার্তিককে থাকতে দেয়া হলো মানিকের সাথে। কার্তিক প্রায় সারাদিন কাঁদতো 'মা মা' করে। মানিক কার্তিকের সৌভাগ্য দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। কার্তিকের জলজ্যান্ত 'মা' আছে, যে কিছুদিন পর তার সাথে দেখা করার জন্য আবার আসবে। কিন্তু সেই কিছুদিন আর পার হয় না, কার্তিক তখনো তিন বেলা খাওয়ার পর নিয়মিত বিলাপ করত। আয়ারা এসে ধমক দিয়ে যেত, বলত,

তোর মার বিয়া হইছে আবার, কেমনে আইব?

কিন্তু কার্তিকের বিশ্বাস ছিল তার মা আসবে, মানিকও তা বিশ্বাস করত। মানিক যখন তার ব্যঞ্জনবর্ণের মার নাম আওড়াত তখন শুধু কার্তিকের মায়ের অশ্রুসিক্ত মুখটাই মনে ভাসত। একদিন সে কার্তিককে প্রস্তাবটা দিয়েই দিল, বলল—

খাওয়ার সময় আমার ডাল আমি তোকেই দিব, তুই আমাকে তোর মা দিস।

শুধুমাত্র খাওয়ার সময় কার্তিক প্রস্তাবটা মেনে নিত। অর্ধপেটে মায়ের স্বপ্নে বিভোর মানিকের ঘুম আসত না। কার্তিকের কাছে শুধু মায়ের গল্প শুনত। মা কিভাবে তাকে ঘুম পাড়াতো, কিভাবে মুখে তুলে খাওয়াতো, মায়ের কোলে মাথা রাখলে কীভাবে হাত বুলিয়ে দিত, সব খুঁটিনাটি শুনত সে। আর কল্পনায় কার্তিককে সরিয়ে নিজেকে ভাবত। কার্তিকের মা কখনো আসেনি, মানিকের ডাল, মাছ বৃথাই কার্তিকের পেটে যেত।

অনাথদের বাবা-মা ভূতের মতো তাদের ঘাড়ে চেপে বসে, তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু অস্বীকার করাও যায় না। তারা নেই কিন্তু তাদের নাম লেগে যায় আঠার মতো। স্কুলে নিজের নাম লিখতে শেখানোর পরই বাবা-মায়ের নাম লেখা শিখানো হয়। মানিক খুব যত্ন করে রুল টানা খাতায় নিজের মাকে ফুটিয়ে তুলল, বাবাকেও অক্ষর দিয়ে এঁকে দিল খাতায়। বেশ কিছুক্ষণ স্পর্শ করল আঙুল দিয়ে। রুল টানা খাতা থেকে কৃষ্ণ কুমার মিত্র এবং লক্ষ্মীরানী মিত্র যেন তার দিকে মায়া ভরা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে। মানিকের নিজের কিছুই ছিল না, কোনো এক ধনীর নাদুসনুদুস পুত্রের ঢিলেঢালা জামা আর দড়ি দিয়ে বেঁধে হাফ প্যান্ট পরত, তার সব কিছুই ছিল অন্য কারো উচ্ছিষ্ট। এই প্রথম নিজের কিছু হলো তার, তার বাবা-মা হলো।

কিন্তু তার ভুল ভাঙতে বেশি দিন লাগল না। তার সাথের আরো তিনটা ছেলেও বাবার জায়গায় কৃষ্ণ কুমার মিত্রের নাম এবং মায়ের জায়গায় লক্ষ্মীরানী মিত্র লিখেছে। এটা কী করে সম্ভব! যা তার ছিল তা তার একার নয় তবে। পরে জেনেছিল এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তার কলমের পিতা-মাতা, যাদের কোনো পরিচয় নেই তাদের তারা নিজেদের নাম দিতেন। এখনো সেই চর্চা চালু আছে। মানিক নিজের যা পেয়েছিল, সেই বাবা-মায়ের নামটাও উচ্ছিষ্ট। তার মৃত বাবা-মায়ের আবার মৃত্যু হলো। এবারের মৃত্যুতে মানিকের মনে হলো তার সব কিছু হারিয়ে গেছে। বাবা-মায়ের নাম দুটি ফরম পূরণ ছাড়া আর কখনো লিখেনি সে, মনেও আনেনি। এই নামগুলো শুধু প্রয়োজনের, এই নামে কোনো আত্মা নেই, কোনো আবেগ নেই, শুধু আছে কালো জড় অক্ষর।

কার্তিকের সাথে দেখা হয়েছিল অনেক বছর পর। কার্তিক অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফার্মগেটে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছিল। মানিক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল। ভিক্ষার জন্য বাড়িয়ে দেয়া কার্তিকের হাত ধরে শুধু কার্তিকের নাম ধরে ডেকেছিল। মুহূর্তেই কার্তিকের চোখ খুলে গেল, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল, দৃষ্টি ফিরে এলো। মানিককে জড়িয়ে ধরল, এতক্ষণ গলায় যে আকুতি আর দুর্বলতা ছিল সব শেষ হয়ে গেল। এই অলৌকিক ঘটনায় মানিক হতবিহ্বল হয়ে গেল, আশেপাশের মানুষও। একজন ভিক্ষুক একজন ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরেছে এবং মানিক মানিক বলে আনন্দে চিৎকার করছে,

চোখ কচলে দেখছে সবাই। পাশের বোবা ভিক্ষুকটিও প্রথমে একটু অবাক হলো, তারপর বলল—

কার্তিক্যা তুই আমাগো ব্যবসা নষ্ট করবি, হালার পো।

গালি খেয়ে যেন কার্তিক আরো খুশি হয়ে গেল, নিজের পয়সা ভর্তি থালাটা বোবা ভিক্ষুককে দিয়ে চলে এলো। বোবা লোকটি আর কথা না বলে স্বভূমিকায় ফিরে গিয়ে ব্যবসায় মনোযোগ দিল।

মানিকের হতভম্ব ভাবটা যেন কাটতেই চাচ্ছে না। কার্তিক তার অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, চোখে আঠা লাগাইয়া ভিক্ষা করি। কষ্ট আছে, তয় ইনকাম ভালোই।

মানিক বলল—

অন্য কোনো কাজ করতে পারিস না?

আমার কাজডারে ছোড কইরা দেহিস না, এষ্টিং জানা লাগে। আর কয়েক দিন এদিকে ভিক্ষা কইরা যাত্রাপালাতে যামুগা। নায়কের পাট পাইতেও পারি, তোর ভাইল মাছ খাইয়া শইলডাও তাগড়া হইছে।

ভাল, মাছের শোধ দে তাহলে?

শোধ দিমু কেমনে? আমার মা মইরা গেছে।

কী অবলীলায় বলে দিল কার্তিক। মানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কার্তিকের দিকে। সেদিন অনেক অনুরোধ করার পরও কার্তিক মানিকের সাথে যায়নি। চোখে আঠা লাগিয়ে চলে গিয়েছিল নিজ ব্যবসায়।

বারান্দায় টুলে বসে আছে মানিক। এই বাড়ি ছেড়ে কাল চলে যাবে পাহাড়ে। কেমন যেন মায়া লাগছে বোবা বাড়িটার জন্য। এতদিন সে ছিল, রাতে মরচে পড়া গেইট খুললে গেইটটা আর্তনাদ করে উঠত। ঘরের দরজা লাগানোর ঠুকঠাক শব্দ হতো, জানালার কপাট খুলে দিয়ে জোছনা ঢুকাত ঘরে। শব্দগুলো যেন জানান দিত এই বাড়ি মরে যায়নি, এখনো বেঁচে আছে। মানিক শুয়ে পড়েছে, জানালার পর্দা ঠেলে মৃদু বাতাস ঢুকছে ঘরে। পাশের বাসার বৌদি তার ছেলেটিকে ঘুম পাড়ানোর জন্য ঘুমপাড়ানি গান গাইছে।

রাতের এই সময়টার জন্য মানিক সারাদিন অপেক্ষা করে থাকে। মনে হয় যেন কেউ হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, কার্তিকের মায়ের চেহারাটা চোখে ভাসে তখন। তার অজান্তেই গান শুনতে শুনতে চোখ টলমল করে ওঠে, চোখ বন্ধ করলে চোখ ছাপিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মানিকের মনে হলো, কার্তিককে বলে যাবে এখানে থাকতে, যেভাবেই হোক রাজি করাতেই হবে। এই বাড়িকে মরতে দেয়া যাবে না। পাশের বাসার বৌদির ছেলেটি আজ ঘুমাতেই চাচ্ছে না, মায়ের কাছে আবদার করে বলছে, আরেকটা।

মানিকও চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলল, আরেকটা।

ঢাকায় মানিকের আপন কেউ নেই, কিন্তু যতই বাসটি শহর ছেড়ে দূরে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে ততই মনে হচ্ছে পুরো শহরটাই তার আপন। ধুলো ওড়ানো রাস্তা, খোলা ম্যানহোল, ডাস্টবিন উপচে পড়া ময়লা, লোকজনে ঠাসা লোকাল বাসে ঘামের গন্ধ সবই মনোহর হয়ে উঠছিল। মানিকের মনটা উদাস হয়ে যায়, কী যেন ফেলে চলে এসেছে মনে হয়। দূরে গ্রামগুলো সাঁই সাঁই করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, তার খুব জানতে ইচ্ছা করে ঐ দূর গ্রামে কারা থাকে? তারাও কি হাসে, কাঁদে? তাদেরও নিশ্চয়ই অনেক আক্ষেপ, অনেক না পাওয়া। কিন্তু দূর থেকে দেখে মনে হয় সবুজ সে গ্রামে কোনো দুঃখ নেই। গ্রামগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গেল বাসের জানালা থেকে। সবুজ ক্ষেতের প্রান্তে উঁচু সবুজ পাহাড় দেখা গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখছে মানিক। ছোটখাটো টিলা সে দেখেছে কিন্তু পাহাড় বুঝি একেই বলে। পাহাড়গুলো জানালাতে আরো বড় হতে লাগল। একেবারে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ধীর লয়ে চলছে বাস। মানিক জানালা খুলে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখছে যতক্ষণ পাহাড়ের মাথাটা রাস্তার বাঁকে হারিয়ে না যাচ্ছে। একটু পরেই বুঝল সে পাহাড়ের দেশে চলে এসেছে, পাহাড়ের পাশে আঁকাবাঁকা, উঁচু-নিচু রাস্তা। রাস্তার পাশে তাকালে দেখা যায় অনেক নিচে ঘন গাছের সবুজ সমুদ্র। কিছু কিছু পাহাড় খুব বিশাল কিন্তু একা, আশেপাশে টিলাও নেই। সেই পাহাড়ের ঠিক চূড়াতে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর।

একা পাহাড়ের মাঝে কে থাকে একা একা? মানিকের মনে হলো তার চোখ ক্লান্ত হবে না কখনো পাহাড় দেখতে দেখতে। বাসের জানালায় বসেই বুঝি জীবন পার করে দিতে পারবে। একটু পরেই মনে হলো, না, পাহাড় দেখলেই সেই পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে।

ছোট্ট কুঁড়েঘরে কে থাকে জানতে ইচ্ছা করে।

বাস থেকে নেমে মানিক তার একমাত্র ব্যাগটি বাম কাঁধে ঝোলাল। ডান কাঁধটিতে ব্যথা করছে। সেইটি তার পাশের যাত্রীরা নিজেদের নিদ্রাকার্যে ব্যবহার করেছে। ঢাকা থেকে এত দূরে এসেও মানিক নিজের কাঁধের স্বত্ব ফিরে পেল না।

বান্দরবান শহরটি ছিমছাম। অতিরিক্ত সাজানো নয় আবার একেবারে অগোছালোও নয়। মানিক ভেবেছিল এখানে শুধুমাত্র পাহাড়ি মানুষরাই থাকে কিন্তু শহরে নেমে তার মনে হলো বাঙালিই বেশি। দুই-একটা রিকশা মাঝে মাঝে দেখা যায়। দোকানপাট কিছু বন্ধ কিছু খোলা। অধিকাংশ দোকানিই বাঙালি। দোকানের নাম দেখলেই বুঝা যায়, সেলিম ভ্যারাইটিজ স্টোর, কুলসুম বিউটি স্টোর, লোকমান দাওয়াইখানা। লোকমান দাওয়াইখানাতে বেশ ভিড়, লোকজন আশা এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে, সেখানে বাঙালির পাশাপাশি কিছু পাহাড়িও আছে। একজন পাহাড়ি থামি পরা মহিলা আর একজন ঘোমটা দেয়া বাঙালি মহিলা হাত ধরাধরি করে গল্প করছে, হয়তো সংসারের গল্প। পাহাড়ে যেই ঘৃণা আর হিংসার কথা শুনেছিল এই দৃশ্য দেখলে তা বানানোই মনে হয়।

থানচি বাস স্ট্যান্ডে যে বাসটি দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখে ঢাকার লোকাল বাসের কথা মনে পড়ে গেল। মানিক জানালার পাশে একটা সিটে গিয়ে বসলো। বাসে পাহাড়ি যাত্রীর সংখ্যাই বেশি, তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলছে, মানিকের শুনতে বেশ ভালো লাগছে যদিও কিছু বুঝতে পারছে না। মানিকের পাশে এক বাঙালি এসে বসল, গায়ে জর্দার গন্ধ। লোকটি তখনো পান চিবাচ্ছিল। লোকটিকে দেখেই বুঝা যায় এই লোক বাসে ঘুমাবে এবং মানিকের শার্টে তার মুখ থেকে পানের লাল-রস গড়িয়ে পড়বে। একটু পরেই মানিকের ভুল ভাঙল। লোকটি ঘুমাল না, কথা বলা শুরু করল, বুঝলেন ভাই, আল্লায় অসুখ-বিসুখ দিয়া বান্দাগো টেস্ট করে। তার টেস্টে পাস করলে আবার নিজেই রোগ সারায়ে দেন। ডাক্তার কবিরাজ তো সব উছিলা। লোকমান কবিরাজও উছিলা, কিন্তু আল্লাহর নেক নজর আছে তার উপর। ডাক্তর-ফাক্তর যেই রোগ সারাইতে পারে না, হে পারে। যার পাপ বেশি তারে ডাক্তরের বাপেও বাঁচাইতে পারব না। তবুও এই বিধর্মী গো মুল্লুকে কিছু বালা মানুষ আছে, যার উছিলায় এখনো মানুষের অসুখ-বিসুখ সারে। আপনে কী বলেন?

মানিকের অভিমত চাওয়া হলো বোধহয়। মানিক একটু 'হুঁ' করে শব্দ করল। লোকটির জন্য তাই যথেষ্ট। সে আবার শুরু করল, আসলে দেশে রোগবালাই বাড়ছে এই মালাউন আর এই পাহাড়ি শয়তানগুলার জন্য। পর্দা নাই, কিছু নাই, মাইয়া মানুষ লুঙ্গি পইরা ঘুইরা বেড়ায়। বুকে কাপড় নাই, পাছাত কাপড় নাই, ছিঃ ছিঃ। মালাউনগুলার লগে এই পাহাড়িগুলারেও গণ্ডগোলের বছর দেশ থেইক্যা তাগানোর দরকার আছিল।

বাস চিকন রাস্তা ধরে এগুচ্ছে। চারিদিকে পাহাড়ের সমারোহ। মাঝে মাঝে মানুষের দেখা পাওয়া যায়। মাথায় ঝুড়ি নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কোনো এক পাহাড়ি মহিলা। লোকটি ঘাড় বাড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় মহিলাটিকে দেখল। তারপর আবার শুরু করল, আল্লাহর গজব পড়ব পর্দা ছাড়া চললে। তারার আছে খালি নাইচ আর গান। মানুষ মরলেও নাচে, কেমুন পাষাণ মাগীগুলা। মালাউনরাও পূজা করে খালি নাচতে আর মদ খাইতে। পর্দা নাই, কিছু নাই।

এমন সময় বাসে পাহাড়ি একটি মেয়ে উঠল, লোকটি কথা বন্ধ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি পেছনের সিটে গিয়ে বসল। লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যতক্ষণ মেয়েটিকে দেখা যায়। সে কাপড়ভেদী দৃষ্টির অভাব বোধ করছিল বোধহয়।

এবার মানিক লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, চোখের পর্দা বলতে কিছু নাই?

লোকটিকে একটু ক্ষুব্ধ দেখাল। সে এতক্ষণ পাশের ভদ্রলোককে নিজের দলের মনে করেছিল। তার মুখে এই ধরনের প্রশ্ন শুনে একটু অবাকও হলো। মানিক এবার লোকটিকে হতভম্ব করে বলল, লুঙ্গি পরা মেয়ে দেখতে আপনার এত খারাপ লাগে যে আপনি চোখ ফেরাতে পারেন না, তাই না?

লোকটি অবাক হলো, ক্ষুব্ধ হলো কিন্তু একটু লজ্জাও পেল না, ইতর প্রকৃতির লোকের লজ্জা থাকে না। সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রশ্ন করল,আপনার নাম কী?

মানিক উদ্ধতভাবেই বলল—

আমার নাম মানিক মিত্র, জি মিত্র। আমি মালাউন।

লোকটি যেন সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল। মালাউন শালায় আর কী বুঝবে! একটু পরে উঠে অন্য সিটে চলে গেল।

মানিক এতক্ষণে জানালা দিয়ে বাহিরে তাকানোর ফুরসত পেল। রাস্তাটা বড় এক অজগর সাপের মতো শুয়ে আছে পাহাড়ের গা বেয়ে। নিচে তাকালে রীতিমতো কলিজা কেঁপে ওঠে, বাস একটু এদিক-সেদিক হলেই কয়েক হাজার ফুট নিচে গিয়ে পড়বে। পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা মেঘের অপরূপ দৃশ্যও মানিকের মন থেকে উচ্চতাভীতি দূর করতে পারল না। সে বারবার ড্রাইভারের দিকে তাকাচ্ছে, যেন সে না তাকালে ড্রাইভার অমনোযোগী হয়ে যাবে। মাঝে মাঝেই ড্রাইভার কন্ডাক্টরের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলছে। সে মুহূর্তেই হয়তো সামনে বিশাল বাঁক। মানিক ভাবছে এই বুঝি গেল বাস খাদে। অস্ফুটে চিৎকার দিয়ে উঠল কিন্তু ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে রেখেই বাঁক ঘুরিয়ে ফেলল। এই রাস্তা তাদের মুখস্থ। চোখ বন্ধ করেও হয়তো চালাতে পারবে।

থানচিতে যখন পৌঁছাল তখন সূর্যটা দুপুরের অহংকার ছেড়ে বেশ বিনয়ী হয়ে গেছে। একটু লাল রং ধরেছে লজ্জায়। ঘাটের কাছে সারি সারি অনেকগুলো ডিঙ্গি বাঁধা। নদীর ওপারে থানচি বাজার। এই বাজারেই একসময় নৌকার যাত্রীরা এসে বিশ্রাম করত।

মারমা ভাষায় থান চৈ মানে বিশ্রামের স্থান। থান চৈ থেকেই বিবর্তিত থানচি হয়ে গেছে। বাজারে এখনো কোলাহল আছে, বিরাট গাছের নিচে কিছু বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা দোকানপাট এই পার থেকেও দেখা যাচ্ছে। এই পার সেই তুলনায় নিস্তব্ধ। মানিক বদরুল আলম সাহেবের বন্ধু শফিক সাহেবের কাছে যাবে, বাকি ব্যাবস্থা কাল হবে। ঘাটের কাছে এক মারমা মাঝি গাছে হেলান দিয়ে বিড়ি ফুঁকছিল, তার গায়ে শার্ট ছিল কিন্তু শার্টে কোনো বোতাম নেই। দুই পাশে শার্টের দুই কোনা বাতাসে উড়ছে। মানিককে দেখেই হাতের বিড়ি ফেলে দিয়ে বলল—

বাজারে যাইবেন?

মানিক ঘাড় নাড়িয়ে বলল, না, আমি শফিক সাহেবের কাছে যাব। উনি কোথায় থাকেন?

মাঝিটি মাটি থেকে বিড়িটি আবার তুলে নিল, তারপর আবার মনের আয়েশে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল কিন্তু আর কোনো কথা বলল না। মানিক একটু বিব্রত হলো, বাজারে না গেলে কি মাঝিদের কথা বলা নিষেধ নাকি? এমন সময় পাশে থাকা একজন বাঙালি যুবক ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করল—

আপনি কি ঢাকা থেইক্যা আইছেন?

মানিক বলল—

হ্যাঁ, আমি শফিক সাহেবের কাছে যাব। তুমি কি একটু দেখিয়ে দিতে পারবে?

ছেলেটি বলল--

চলেন, স্যারে আমারে পাঠাইছে। আমার নাম হাশেম।

মানিক বলল—

হাশেম ঐ লোকটি আমার সাথে পরে কথা বলল না কেন?

হাশেম বলল—

স্যারের নাম কইছেন যে এই জন্য। কিছু পাহাড়ি স্যারেরে দেখতে পারে না। স্যারের স্কুল জ্বালাইয়া দিছে। স্যারে নাকি তাগো পোলাপাইনের মাথা নষ্ট করতাছে। এইখানে কেউ কাউরে বিশ্বাস করে না। কত মানুষ মরল অবিশ্বাসের কারণে।

মানিক কিছু বলল না, হাশেম তার ব্যাগটি নিজের কাঁধে নিয়ে সামনে হাঁটতে লাগল। তারা লালচে মাটির পথ দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই একসাথে কয়েকটা ঘর দেখা যাচ্ছে। সূর্য ডুবে গেছে, মাঁচার উপরে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘরে ফেরার আয়োজন চলছে।

নিচে হাঁস-মুরগির খোঁয়াড়ে গৃহ প্রবেশের চাঞ্চল্য। মারমা মহিলাটি 'তিড় তিড়' শব্দ করে তাদের দিকনির্দেশনা দিচ্ছিল। উপরে দাওয়ায় বসে শুকনো লোকটি লম্বা বাঁশের চোঙায় তামাক ফুঁকে যাচ্ছে। তার পায়ের লালচে ধুলো জানিয়ে দেয় সারাদিন পাহাড়ে ছিল সে। ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে হাঁস-মুরগির মতো সহজে ঘরে ঢুকানো যাচ্ছে না। আদুল গায়ে নতুন হাঁটতে শেখা ছেলেটি দৌড়ে পাশের বাঁশঝাড়ের কাছে চলে যাচ্ছিল কিন্তু তাদের দেখে দৌড়ে আবার মায়ের কাছে ফিরে গেল। কয়েকটি ঘরে তারার মতো কুপি জ্বলে উঠল, কুপির চারপাশে বসে তারা স্বপ্নের কথা বলে। রাতের বেলা পাহাড়ের সারিগুলোকে বড় বিষণ্ন দেখায়। মানিক হাঁটতে থাকে বিষণ্ন পাহাড় আর স্বপ্নঘেরা জীবন দেখতে দেখতে।

শফিক সাহেবের বাড়িটি এখানকার অন্য বাড়িগুলোর চেয়ে আলাদা। কাঠ দিয়ে বানানো ঘর, উপরে ছনের বদলে টালি। নিচে বেশ কয়েকটা ঘর। অন্য ঘরগুলোতে নিচে গরু, ছাগল, মুরগি থাকে। শফিক সাহেব নিচে তার কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি থাকেন উপরে, একটি ঘর আছে বারান্দার পাশে, সেখানে দুজন পালোয়ান থাকে। শফিক সাহেবের উপর যেকোনো সময় হামলা হতে পারে এই

আশঙ্কায় দুজন পালোয়ান এনে রেখেছেন, তাদের কাজ সারাদিন ঘুমানো আর সারারাত জেগে পাহারা দেয়া। শফিক সাহেবের ঘরে ঢুকেই মানিক একটু চমকে উঠল, এই আঁধারের মাঝে যেন এখানে একটু বেশিই আলো। জেনারেটরের মৃদু শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঘর থেকে দূরে লাগানো হয়েছে যেন শব্দ বেশি পাওয়া না যায়। বেশ গুছানো বসার ঘরটি। পায়ের নিচে মখমলের কার্পেট, বসার জন্য সোফা, দেয়ালে বেশ কিছু ছবি। একটা ছবি চেনা মনে হলো, হ্যাঁ, সাম্পু নদীর ঘাট।

শফিক সাহেব ঘরে ঢুকলেন, বদরুল আলমের চেয়ে ওনাকে দেখতে অনেক কম বয়সী মনে হয়। শফিক সাহেব হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে বললেন—

বদি আমাকে টেলিগ্রাম করে বলেছিল তোমার কথা। তুমি করে বলছি, কিছু মনে করলে না তো?

মানিক হেসে বলল—

তুমি করে না বললেই বরং মনে করতাম।

শফিক আহমেদ বললেন—

গুড, কোনো সমস্যা হয়নি তো আসতে?

না, আচ্ছা এই পেইন্টিংটা নদীর ঘাট না?

হ্যাঁ, আমিই এঁকেছি। ছবি আঁকতে ভালো লাগে আমার। যখন বয়স ছিল তখন নেশা ছিল পয়সা কামানোর। কামিয়েছিও প্রচুর। একসময় মনে হলো আর না, ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ে চলে এলাম। ছেলেমেয়ে বিদেশে থাকে, আমি দেশে একা। একা মানুষদের পাহাড়েই থাকা উচিত। কোলাহলের ভেতর একা মানুষদের একাকিত্ব বেশি ধরা পড়ে। এখানে অগ্রযাত্রা নামে একটা এনজিও চালাই নিজের পয়সায়। গরিব মানুষদের সাহায্য করে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তারা এগুতেই চায় না, আমার অগ্রযাত্রাও থেমে আছে।

একটু থেমেই আবার বললেন—

এখানে বাইরে থেকে যেমন অনেক সুন্দর ভেতরে তেমনি কদর্য রূপ। উগ্রপন্থী সংগঠনগুলো খুব তেতে আছে। বড় সংগঠনগুলোকে সামলানো যাচ্ছে না, এরই মধ্যে আরো অনেক গ্রুপ গজিয়ে উঠছে। এরা অস্ত্র জোগাড় করছে, টাকা-পয়সার জন্য চাঁদাবাজি, অপহরণ শুরু করেছে। তাদেরই বা দোষ দেই কীভাবে! নিজের ঘর বাঁচানোর জন্য সবটাই দিয়ে দিবে তারা। এরশাদ সাহেব ঠেলে বাঙালিদের পাহাড়ে পাঠাচ্ছেন, পরিকল্পিত বনায়নের নামে তাদের জঙ্গল কেটে সাফ করে দেয়া হচ্ছে, তারা তো রিয়েক্ট করবেই।

বাঙালিদের উপর আক্রমণ করছে, বাঙালিরাও তাদের উপর পাল্টা হামলা করছে। সব মিলিয়ে এখানে ম্যাসাকার অবস্থা।

তারপর মানিকের দিকে তাকিয়ে বললেন—

ওহ, তোমাকে তো মনে হয় প্রথমেই ভয় পাইয়ে দিলাম। সাবধান হওয়ার জন্যই বললাম। কিছু মনে কোরো না। বদি, মানে তোমাদের বদরুল স্যার অবশ্য তোমার

ট্রান্সফারের ব্যাপারে চেষ্টা করছে বলল কিন্তু আশা কম। তা তোমার পোস্টিং কি ধানাচিতেই? হলে ভালো হয়, আমার সাথেই থাকতে পারবে।

মানিক বলল—

না আমাকে বোধহয় বলিপাড়া ইউনিয়ন সাবসেন্টারে পাঠাবে, একেবারে সর্বোচ্চ শাস্তি যাকে বলে।

শফিক সাহেবের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেল, বললেন—

বলিপাড়া জায়গাটা সুবিধার নয়। ওখানে আমার একটা স্কুল ছিল, জ্বালিয়ে দিয়েছে। তবে আমার একটা ঘর আছে সেখানে। বাঙালি থাকে আশেপাশে কয়েকজন। ওখানে তোমার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবুও এখান থেকে পালানোর ব্যবস্থা করো। আমি দুজন পালোয়ান নিয়ে থেকেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না।

মানিক বলল—

আমার জন্য ভালোই হলো, আপনিই তো বললেন একা মানুষদের পাহাড়েই থাকা উচিত।

শফিক সাহেব একটু হাসলেন। তারপর হাশেমকে ডাকলেন। হাশেম ঘরে ঢুকতেই বললেন—

বরকত আলী এসেছে?

জ্বি স্যার।

ঠিক আছে, তাকে পাঠিয়ে দাও।

বরকত আলী ঢুকতেই, কড়া জর্দার গন্ধ নাকে এসে ঠেকল। মানিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বাসের সেই ইতর লোকটি। বরকত আলীও মালাউনটার চেহারা দ্বিতীয়বার দেখার আশঙ্কা করেনি। এই দ্বিতীয় সাক্ষাতে তার উদ্বেলিত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না,

হলোও না কিন্তু মুখে একটা বিগলিত হাসি টেনে শফিক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল—

স্যার আমারে বুলাইছেন?

শফিক সাহেব বললেন—

হ্যা তোমাকে বুলিয়েছি, এত দেরি হলো কেনো? তোমার না আজ দুপুরে ফেরার কথা?

বরকত আলী মুখে হাসিটা ধরেই রেখেছে। শফিক সাহেব মানিক মিত্রকে দেখিয়ে বললেন—

উনি এখানকার নতুন ডাক্তার। বলিপাড়াতে আমার ঘরটাতে সে থাকবে এখন থেকে, তুমি ব্যবস্থা করে দাও। আর আজ রাতে ভালো কিছু আয়োজন করো।

বরকত আলী একটু মুচকি হেসে বলল—

গরু রাঁধতে বলব স্যার?

শফিক সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন—

গরু ছাড়া যা আছে সব করো।

মানিক এবার বলল—

গরুতেও আমার কোনো সমস্যা নেই।

বরকত আলী একটু হতাশই হলো, মালাউনটাকে জব্দ করতে না পেরে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই শফিক সাহেব বললেন, বরকত আমার ম্যানেজার। একটু বেশি কথা বলে।

মানিক বলল—

আমি জানি। বাসে কিছু সময় সে আমার সহযাত্রী ছিল।

শফিক সাহেব বললেন—

বেশ। তাহলে তো হলোই। চলো তোমাকে আমার স্টুডিও দেখাই। একটা নতুন ছবি আঁকছি, সেটা দেখবে।

স্টুডিওটি বেশ ছিমছাম, একটা টুল, কাঠের ফ্রেম, রঙতুলি রাখার জন্য একটা টেবিল আর বেশ কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ক্যানভাস ছাড়া আর কিছুই নেই। কাঠের ইজেলে আটকানো একটা অসম্পূর্ণ ছবি। একটা নীল রঙের পাহাড়ের চূড়ায় ডালপালা ছড়িয়ে আছে একটা গাছ। গাছটা এতই বিশাল যে মনে হচ্ছে পুরো পাহাড়টিকে নিজের পাতার আঁচলে ঢেকে দিবে। মানিক ছবিটাতে তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করল—

এটা কোন জায়গা? পাহাড়ের রঙ নীল কেন?

শফিক সাহেব বললেন—

জানি না। কল্পনা করে এঁকেছি। মানিক, আমার স্টুডিওতে আমি সবাইকে আসতে দেই না। যাদের আমি পছন্দ করি তাদের ঢুকতে দেই। আমার স্ত্রী যখন জীবিত ছিল তাকেও কখনো আমার স্টুডিওতে ঢুকতে দেইনি। আর যারা আমার স্টুডিওতে আসে তাদের আমি আমার আঁকা ছবি উপহার দেই, তুমি বলো তোমার কোন ছবি চাই?

মানিক এক মুহূর্ত না ভেবে বলল—

সাঙ্গু নদীর ঘাট চাই আমার।

বরকত আলী পরপর তিনটা পান মুখে পুরেও নিজের রাগ কমাতে পারছে না। ঐ মালাউনটার মেহমানদারি করতে হবে? তার থাকার জায়গা ঠিক করে দিতে হবে? কি জমানা আসল মোসলমান হইয়া মালাউনের সেবা করতে হয়। বরকত আলী অবশ্য তার জীবনের অর্ধেকই মালাউনদের নুন খেয়ে কাটিয়েছে।

নোয়াখালীর শান্তিবাবুরা ছিলেন জমিদারদের উত্তরসূরি। জমিদারি না থাকলেও তাদের ছিল বিশাল কারবার। তাদের খামারে প্রায় আড়াইশ' গরু ছিল, মাছ চাষের জন্য প্রায় পঁয়ত্রিশটি পুকুর ছিল, তাদের জমি মাপা হতো দৃষ্টিসীমায়, যতদূর চোখ যায়। শান্তিবাবুদের খামারগুলোর হিসাব-নিকাশ করত বরকত আলী। প্রায় এগারো বছর এক টানা কাজ করেছে সেখানে। শান্তিবাবু তার জন্য আলাদা ঘর তুলে দিয়েছিলেন উঠানের একপাশে।

কুলসুম শান্তিবাবুর স্ত্রীর ফুট-ফরমায়েশ খাটত। সে যখন উঠান ঝাঁট দিত, তখন বরকত আলী তার ঘর থেকে জানালা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকত। মাঝে মাঝেই সে সবার অলক্ষ্যে কুলসুমকে এটা-সেটা কিনে দিত। কুলসুম উঠান ঝাঁট দেয়ার পাশাপাশি বরকতের ঘরও ঝাঁট দিতো। অনেক সময় লেগে যেত বরকতের ছোট ঘর ঝাঁট দিতে। কয়েক মাস পর কুলসুম তার ঝাঁট দেয়া উঠানে বমি করল। শান্তিবাবুর মা কুলসুমের হাত-পা দেখে বলল—

কি সর্বনাশ করছস লো। কার লগে পেট বাদ্ধছস?

নিতান্ত বাধ্য হয়ে চাকরি বাঁচানোর জন্য কুলসুমকে বিয়ে করে বরকত। কিন্তু তার অত্যাচারে দুই বছরের বেশি টিকতে পারেনি কুলসুম। একদিন সকালে তার নিথর দেহটা পাওয়া গেল মেঝেতে। নিন্দুকেরা বলে, বরকতই মেরেছে বউকে কিন্তু বরকত সেদিন খুব কাঁদল, তার কান্না দেখে নিন্দুকদের মনেও মায়া জেগে উঠল। কতজনের বউই তো মরে, কই কেউ তো এভাবে কাঁদে না! কুলসুমের দুই বছরের কন্যাটিও বেশি দিন বাঁচেনি, নিউমোনিয়া হয়ে সেও মরল।

শান্তি বাবুর মেয়ে সুলেখা বারোতে পা দিয়েছে। বরকতকে ডাকত কাকা। সুলেখার ফর্সা উন্মুক্ত ত্বকের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাত বরকত। মনে মনে বলত, মালাউন মাগীগুলা এত সুন্দর হয় কেন?

আদর করার ছলে বরকত অনেকবার সুলেখার গা ছুঁয়ে দিয়েছে। নিজেকে সামলাতে খুব কষ্ট হতো তার। একদিন নিজেকে দমন করতে পারেনি, আদরের হাত সুলেখার শরীরে পশুর মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছিল কামনা। সুলেখা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল, সে ছুটে বের হয়ে গিয়েছিল, নিজের ঘরে বসে কাঁদছিল অঝোরে, অনেক চেষ্টা করেও কান্না থামাতে পারেনি, প্রচণ্ড ঘৃণায় ডুকরে কেঁদেছিল সে। শান্তি বাবুর স্ত্রী সুলেখাকে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে?

সুলেখা কিছু বলতে পারেনি, কান্নার দমকে কেঁপে উঠছিল সে। শুধু অস্ফুটে বলেছিল, কাকা।

পরদিন বরকতকে বের করে দেয়া হয়। বরকত আলী প্রচণ্ড ক্ষোভে প্রতিশোধের নেশায় উন্মাতাল হয়ে ওঠে। প্রতিশোধের সুযোগ সে খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যায়, দেশে শুরু হলো যুদ্ধ। বরকত আলী দেশ রাজনীতি ধর্ম কিছু বুঝে না। তার কাছে এই যুদ্ধ অবদমিত কামনা নিবারণের যুদ্ধ, মালাউনদের দেশ ছাড়া করার যুদ্ধ। রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিল সে। প্রথমেই সে হামলা করল শান্তি বাবুর বিশাল বাড়িতে। শান্তি বাবু চলিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

বরকত আলী শান্তি বাবুর গলায় ছুরি বসিয়েছিল নিজ হাতে। শান্তি বাবু যতক্ষণ কথা বলতে পেরেছিল, ততক্ষণ শুধু একটা অনুরোধই করেছিল, বরকত, আমার মেয়েটাকে ছেড়ে দিও। সিন্দুকে সোনার গহনা আছে, সব নিয়ে যাও, আমার মেয়েটাকে ছেড়ে দাও।

সুলেখাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে এসেছিল বরকত। এমন রূপসী ছোট মেয়ে পেয়ে পাঞ্জাবিরা বেশ খুশি হয়েছিল তার উপর। সুলেখার জন্য অনেক অপেক্ষা করতে হয়েছে বরকতের, সব অফিসাররা সুলেখাকে ভোগ করার পর সে সুযোগ পেয়েছিল। শুধুমাত্র একটা লুঙ্গি কোনোরকমে গায়ে জড়িয়ে রেখেছিল সুলেখা, একেবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তাকে, আগের সেই মোহনীয় ভাবটা ছিল না। কিন্তু তাতে বরকতের কামনা এক বিন্দুও কমেনি। সুলেখা গায়ের লুঙ্গিটি খামচে ধরে শুধু অস্ফুটে বলেছিল—

আপনি আমার বাবার মতো।

বরকত আলী বিকৃত হাসি টেনে বলেছিল—

ধুর মাগী, মালাউনগো আবার বাপ ভাই আছেনি।

সুলেখা আর কিছু বলেনি, সে পড়ে ছিল একটা লাশের মতো। সেই লাশটা পশুর মতো খাবলে খেয়েছে বরকত আলী। তিন মাস পরে জুলেখা সত্যি সত্যি লাশ হয়ে গিয়েছিল। পাশের মেয়েগুলো হিংসায় তাকিয়ে ছিল তার লাশের দিকে। তাদের ভাগ্যে যে মরণও জুটে না।

যুদ্ধ শেষে বরকত আলী মুক্তিদের কাছ থেকে পালিয়ে এই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। পাহাড় কাউকে ফেরায় না, নিজের উদরে স্থান করে দেয় সবার। সব পাপ লুকিয়ে রাখে।

কাঠের পাটাতনে বসে পানের পিক ফেলে বরকত আলী, মালাউন ডাক্তারটার একটা বিহিত সে করেই ছাড়বে। মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করে নিজের গায়ের জ্বালা কমায় সে।

পাহাড়ি রাস্তার দুই পাশের উপত্যকায় মানুষের বসতি। এক পাশে মারমা বসতি আরেকপাশে বাঙালিরা থাকে। তাদের ঘরগুলো দেখেই বলে দেয়া যায়। বাঙালি বসতির একেবারে এক পাশে মানিকের থাকার ঘরটি। এই ঘরটি মারমাদের ঘরের আদলে বানানো হয়েছে।

চারপাশে বাঁশ দিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে। সেই বেড়াতে এত দিন লতানো গাছাগাছরা বসতি করেছিল, মানিক আসার আগে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। লতানো গাছের ডগাগুলো মাটিতে ঘাসের উপর পড়ে আছে। মাঁচার উপরে থাকার ঘরটি, কাঠের সিঁড়ি আছে একটি, মারমা ঘরগুলোর মতো বারান্দা রাখা হয়েছে, আর ঘরের উপরে খড়ের ছাউনি। এই ঘরটি একেবারে পাহাড়ের পাশে। মায়ের কোল পায়নি মানিক কিন্তু পাহাড়ের কোলে ঠিক জায়গা পেয়ে গেল।

ঘরে খাট আছে, সুন্দর করে বিছানা পাতা হয়েছে। জানালা আছে তাতে আবার হালকা রঙের পর্দা টাঙানো হয়েছে। মানিক জানালার পর্দা সরিয়ে দিল, জানালা দিয়ে শুধু পাহাড়ের সারি দেখা যায় অনেক দূর পর্যন্ত। ঘরে বাসন-কোসন, রান্নার সামগ্রী সব আছে।

দরজায় কাঠের তৈরি ঝুলন্ত হ্যাঙ্গারে বেশ কিছু রঙিন শার্ট ঝুলতে দেখা গেল, টেবিলে উদ্ভিদবিজ্ঞানের কিছু বই। এক কোণে একটা ফটোফ্রেম। একটা বাচ্চা মেয়ের ছবি তাতে। মানিক হাশেমকে জিজ্ঞাসা করল—

এই ছবি কার?

রেঞ্জার সাহেবের মেয়ে।

উনি এখানে ছিলেন? এই জিনিসপত্র কি তার?

হ, উনাদের বাঙলো মেরামত করার সময় এদিকে আছিলেন।

তো উনার জিনিসপত্র নিয়ে যাননি?

না, বাঙলো মেরামত হওয়ার আগেই উগ্রপন্থীরা তারে ধইরা নিয়া গেছে। এক সপ্তাহ আগে তার লাশ পাওয়া গেছে সাঙ্গুর পাড়ে। খালি শইলডা আছিল, মাথা নাই। মাথা ছাড়াই মাডি দিতে হইছিল।

মানিক মেয়েটির ছবিটি টেবিলের উপর উল্টে রাখল, বাবা-হারা আদুরে মেয়ের ছবির দিকে তাকানোর সাহস তার নেই।

বলিপাড়া ইউনিয়ন সাবসেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মানিক। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উপরে উঠে গাছপালায় ঢাকা ছোট একটি ঘর। ভূত ছাড়া এখানে কারো আনাগোনা হয় বলে মনে হয় না। দেয়ালে শেওলা জমে আছে, সামনে ঘাসগুলো কোমর সমান উঁচু, প্রশ্রয় পেলে আর কিছুদিন বাদে তারা মানুষের উচ্চতায় চলে আসবে। ভেতরে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে, সুখের সংসার পেতেছে তারা। একটা পঁচা গন্ধ ভেসে আসছে ঘাসের ভেতর থেকে, কিছু একটা মরে পঁচে গেছে। এই সাবসেন্টারে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং একজন নার্স আছে, মাসে একদিন একটা কাজই করে তারা, থানচি থেকে বেতন তুলে নিয়ে আসে। এই ভল্লাটে তাদের চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। তবে আজ একটু সুখের ব্যাঘাত ঘটেছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলিয়াসকে তার মুদি দোকান ছেড়ে নতুন ডাক্তারের অভ্যর্থনায় আসতে হয়েছে। নার্স ইয়াসমিনকে পাওয়া যায়নি, সে গত মাসের বেতন খরচ করার জন্য কোথায় যেন ঘুরতে চলে গিয়েছে। গত পাঁচ মাসে এখানে কোনো ডাক্তারের পদধূলি পড়েনি, আর রোগীরা কোনোকালে এখানে পদধূলি দিয়েছিল সে ইতিহাস কেউ জানে না। এখানে পাহাড়িরা সরকারি ডাক্তারকে বিশ্বাস করে না, উগ্রপন্থীরা পাহাড়িদের সরকারি হাসপাতালে যেতে মানা করে দিয়েছে, তাদের ধারণা সরকার তাদেরকে নির্মূল করার জন্য এখানে ডাক্তার পাঠিয়েছে। ডাক্তাররা এমন ওষুধ দিবে যে তারা আর বংশ বৃদ্ধি করতে পারবে না। আর বাঙালিরা ডাক্তারদের মূর্খ মনে করে, ডাক্তাররা পানি পড়া দিতে পারে না, তাবিজ দিতে পারে না, মূর্খই তো। তার চেয়ে লোকমান কবিরাজ অনেক বেশি দক্ষ এবং বিশ্বস্ত।

ডাক্তাররা প্রথম দিন আসে, জঙ্গল কিংবা হাসপাতালটার চেহারা দেখে তারপর চলে যায়। ইলিয়াস সে জন্য তার ভাগ্নেকে আধা ঘণ্টার জন্য দোকানের ভার দিয়ে এসেছে। মানিক ইলিয়াসকে অবাক করে দিয়ে বলল—

ইলিয়াস চলো ভেতরে যাওয়া যাক।

ভিত্রে গিয়া কী করবেন স্যার? চলেন বাজারে যাই, পাহাড়ি পাউল্লা পাওয়া যায়, হেভি টেস্ট। আপনে যাইবেন কুন সময়? যদি সময় থাকে তো এই গরিবের ঘরে এক বেলা দুইটা ডাইল-ভাত খাইয়া যাবেন।

ইলিয়াস, আমি এখানেই থাকব। এখন ভিতরে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। আর নার্সকে খবর দিও কাল সকাল থেকে যেন ডিউটিতে থাকে।

ইলিয়াসের সুখের দিনের অকাল সমাপ্তিতে তার মন বিষাদে ছেয়ে গেল। ঘাসের মাঝ বরাবর কোনোমতে হেঁটে হাসপাতালের বারান্দায় এসে পৌঁছল। দুটি রুমের একটি রুমে তালা দেয়া অন্যটি ফাঁকা, সেই রুমের দরজাটিও গায়েব হয়ে গেছে। ডাক্তারের বসার ঘরটি তালা দেয়া, চাবি হারিয়ে ফেলেছে ইলিয়াস। অনেক দিন এই চাবির কোনো প্রয়োজন হয়নি। একটা ইট দিয়ে তালা ভাঙল, দরজা খোলার পর ভেতর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বের হলো। ইলিয়াস জানালা খুলে দেয়ার জন্য

ভেতরে ঢুকেই তিন লাফ দিয়ে একেবারে গেইটের বাহিরে চলে গেল। মানিক ইলিয়াসের এমন বানরের মতো লাফিয়ে বাহিরে চলে যাওয়ার হেতু খুঁজতে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। 'ওরে বাবা' বলে সেও দৌড়ে বাহিরে চলে এলো। ভেতরে বিশাল বড় এক অজগর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের অযাচিত আগমনে সাপটির নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটেছে। গলা উঁচিয়ে তার বিরক্তি জানান দিয়ে অজগর সাপটি মানিকের মতো অনাথকেও তার বাবার কথা মনে করিয়ে দিল।

মানিক ইলিয়াসকে পাঠাল লোকজন আনতে। বিনা ডিগ্রিতে ডাক্তারের চেয়ার দখল করা সাপটিকে উৎখাত করতে হবে। ইলিয়াস অনেকক্ষণ পরে একটা মারমা কিশোর ছেলেকে নিয়ে হাজির। মানিক বিরক্ত হলো, এই বাচ্চা ছেলে সাপ দেখে আবার অজ্ঞান না হয়ে যায়। ছেলেটি হেলতে-দুলতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। একটু পর দেখা গেল, ছেলেটি সাপের লেজ টানতে টানতে সাপটিকে বের করে আনছে। সর্প জাতির সকল অহংকার ধুলোয় মিশে গেল, হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য যথেষ্ট মোচড়ামোচড়ি করল অজগরটি, কিন্তু মারমা ছেলের বগল থেকে লেজ এবং সম্মান বাঁচানো একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ল। এরকম সাপ পাহাড়ে অনেক দেখে পাহাড়িরা, তাদের ভয়ে তটস্থ থাকে সাপেরা। সকাল বেলা গর্ত থেকে বেরিয়েই প্রার্থনা করে, কোনো পাহাড়ির পায়ের নিচে যেন না পড়ে। দুই-একটা ভাগ্যবান সাপ কালেভদ্রে বাঙালি পেয়ে যায়। এই সাপটি যেমন পেয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যদেবী অজগরটির উপর বোধহয় বেশিক্ষণ তার সুদৃষ্টি রাখেননি।

কোমর সমান ঘাস কাটা হলো, সেই ঘাস নেয়ার জন্য ছাগলের মালিকদের কাড়াকাড়ি অবস্থা। ঘাস কাটার পর সেখান থেকে তিনটা মরা ইঁদুর আর একটা জ্যান্ত গোখরা আবিষ্কৃত হলো। আত্মগোপনে থাকা চোর পুলিশ দেখলে যেভাবে দিগ্বিদিক ছুটতে চায়, গোখরাটি সেভাবে ছুটে নিজের মান এবং প্রাণ বাঁচাতে চাইল। কিন্তু মধ্যবয়স্ক এক লোক গোখরাটিরে মাথায় লাঠি দিয়ে চেপে ধরল, তারপর মাথাটা ধরে একটা গামছায় পুরে ফেলল। সাপুড়েরা নাকি প্রায়ই এখানে আসে সাপ কেনার জন্য। অজগর সাপ সাপুড়েরা কিনে না তাই সেটা এখন বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। বাচ্চারা পালা করে লেজ টানছে অজগরের।

ধুলোমাখা হাসপাতালটি পরিষ্কার করা হলো, দরজায় নতুন পর্দা টাঙানো হলো। রোগীদের বসার জন্য বারান্দায় চেয়ার বসানো হলো। ওষুধ এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম সাপ্লাইয়ের জন্য চিঠি লিখে ইলিয়াসকে থানচি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠাল। সব করা হলো, কিন্তু যাদের জন্য এত আয়োজন তাদের দেখা নেই। ইলিয়াস সকালবেলা আসে, বাহিরে চেয়ারে বসে ঝিমায়। নার্সের দেখা মিলেনি এখনো। ইলিয়াস মাঝে মাঝে নতুন ডাক্তারের সাথে আলাপ জমানোর চেষ্টা করে কিন্তু নতুন ডাক্তার কেমন যেন নিরামিষ মানুষ, দশটা কথা বললে একবার 'হুঁ' বলে। কথা ঝলে মজা নেই। নার্সটা থাকলেও না হয় একটু আলাপ জমানো যেত। মহিলাদের গল্পের অভাব হয় না।

হাসপাতালে বসেই মানিক প্রায়ই মারমা পাড়া কিংবা বাঙালি পাড়া থেকে মহিলাদের বিলাপ শুনতে পায়। এখানে প্রায়ই মানুষজন মারা যাচ্ছে। কিন্তু কেউই

হাসপাতালে আসছে না। সন্ধ্যাটা মানিক পাহাড়ে কাটায়, পাহাড়ের আড়ালে সূর্যের মুখ লুকানো দেখতে তার খুব ভালো লাগে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়ায় সবুজ ঘাসের বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, আকাশ পরিষ্কার থাকলে তারাদের হাট বসে। মানিক কখনো তারা গুনার চেষ্টা করে না শুধু শুয়ে শুয়ে দেখে। এই পাহাড়ের কোল ঘেঁষে মারমা পাড়া। সেখানেও তারা জ্বলছে—

কুপিবাতির তারা।

একদিন বিকালবেলা মানিক মারমা পাড়া পার হয়ে পাহাড়ে যাচ্ছিল, তখনই একটা বাচ্চা ছেলের গোঙানি শুনতে পেল সাথে একটা চাপা কান্না। ঘরটির বাহিরে কোমরে এক খণ্ড কাপড় ঝুলিয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পাশের বাড়ির উঠানে তার বয়সীরা দৌড়ে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছে। একজন সবাইকে ছুঁতে যাচ্ছে, সবাই দৌড়ে পালাচ্ছে, যাকে ছুঁয়ে দিবে সেই চোর হয়ে যাবে। সেই কলঙ্ক থেকে বাঁচতে সবাই দৌড়ে পালাচ্ছে, কাউকে ছুঁতে না পেরে বর্তমান চোর এ আঙিনায় এসে বাচ্চা মেয়েটিকে ছুঁয়ে দিল।

কিন্তু বাচ্চা মেয়েটি নির্বিকারভাবে বসে আছে, খেলার নিয়ম অনুযায়ী আরেকজনকে ছুঁয়ে সে নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করার কথা। কিন্তু কলঙ্ক নিয়ে মেয়েটি ঠায় বসে আছে, তার চোখের নিচে গাল বরাবর দুটি রেখা জানান দেয় সে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে। মানিক কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

কী হয়েছে তোমার? কেন কাঁদছ?

মেয়েটি মানিকের দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল, কিন্তু কিছুই বলল না। আগন্তুকের কাছে নিজের দুঃখ বর্ণনা করার কোনো আগ্রহ বোধ করছে না সে। মানিক মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যাচ্ছিল। পেছন থেকে মেয়েটি বলে উঠল—

জামা কোগ্রি।

মানিক ভ্রূ কুঁচকাল, মারমা ভাষা সে বুঝেনি, মেয়েটি এবার বাংলায় বলল—

আমার ভাই, মরি যাচ্ছে।

আচমকা এক বাঙালিকে ঘরে ঢুকতে দেখে বাচ্চাটির মা যেন ছেলের মরণশয্যার শোক ভুলে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ছোট্ট একটি ঘর, বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঘরে একটা দড়িতে পুরনো কাপড় ঝুলানো আছে, একপাশে কিছু বস্তা জড়ো করে রাখা হয়েছে, বাঁশের খুঁটির সাথে একটি পাতিল ঝুলানো আছে, ছাদ থেকে কিছু শিকে ঝুলছে। ঘরের মাঝখানে একটা বাচ্চা ছেলে শুয়ে আছে, তার মাথার কাছে কিছু বাসি রঙিন ফুল, ছেলেটার গা মোটা কাঁথা দিয়ে ঢাকা আছে। তার পাশেই একপাশে মেঝেতে বসে কাঁদছিল ছেলেটির মা, যিনি এখন কান্না বন্ধ করে হতবাক হয়ে মানিকের দিকে তাকিয়ে আছে। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, বাতাস, রোগ-ব্যাধি সব অবাধে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু দরজা দিয়ে একজন বাঙালি প্রবেশ করা এখানে আতংকের ব্যাপার। মানিক তাকে আশ্বস্ত করতেই বলল—

ভয় পাবেন না, আমি একজন ডাক্তার, আমাকে একটু দেখতে দিন।

এই কথাতে মারমা মহিলাটিকে যেন আরো বেশি আতঙ্কিত মনে হলো। মহিলাটি কারো কিছু বলার আগেই মানিক ছেলেটির কপালে হাত দিল, বেশ জ্বর আছে, ছেলেটি কাঁপছে। ছেলেটির মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—

কিছুক্ষণ পর পর কি ঘাম হয়?

মহিলাটি একটু আশ্বস্ত হয়েছে, ডাক্তার তার ছেলেকে সুস্থ করে তুলবে সে দুরাশা সে করে না, কিন্তু এই মানুষটি তার ছেলের ক্ষতি করবে না এটা জেনে সে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে। সে বলল—

খুব ঘামায়, জ্বর সাইরে যাইবে মনে অয়, কিন্তু সারে না।

বলেই আবার নিজের হাঁটুতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। তার প্রতিবেশী পাঞ্চানের ছেলেটারও এরকম হয়েছিল, বৈদ্য এসে ভাতকরা পূজা করতে বলেছিল, তারা করেনি। করবে কীভাবে, নিজেরাই খেতে পায় না, তাদের জুমের ফসল সব ভেসে গিয়েছিল পাহাড় ধ্বসে। পাঞ্চানের ছেলেটা দুই দিন পরেই মরল।

মানিক বলল—

আপনার ছেলের সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হয়েছে। দ্রুত ওষুধ না দিলে কোমায় চলে যাবে। আমি কিছু ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মহিলাটি ভ্রু কুঁচকাল, ডাক্তারের অদ্ভুত কথা শুনে। তার ছেলে কোথায় চলে যাবে? জ্বর ভালো না হলে যাবে কীভাবে? সে বলল—

মংওয়াইয়ের বাপে বৈদ্যরে আনতে গেছে, ভাতকরা পূজা হইব, ওষুধ খাইয়া কি দেবতার অভিশাপ যায়? আপনে যান, আমাগো ওষুধ লাগব না।

মানিক আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, তখনই দুটি লোক ঘরে ঢুকল। একজনের উদ্বিগ্ন মুখ দেখে বুঝল এটা মংওয়াইয়ের বাবা, আর পাশের গম্ভীর লোকটি বৈদ্য। বৈদ্য লোকটি একেবারে সাধারণ দেখতে, চুল-দাড়ি বড় করে জটা পাকিয়ে আধ্যাত্মিকতার মুখোশ লাগায়নি কিন্তু মুখে গম্ভীর ভাবটা তবুও আছে। পূজার সরঞ্জাম তার হাতে। পূজার থালায় কয়েক রকম পিঠা, কিছু ফুল, পাতা, একটা চামড়া ছাড়ানো মুরগির বাচ্চা। মংওয়াইয়ের বাবা মানিককে দেখে অবাক হলো আর বৈদ্য বিরক্ত হলো। মংওয়াইয়ের মাকে মারমা ভাষায় কী যেন বলল, মানিক কথাগুলো বুঝতে পারেনি কিন্তু এতটুকু বুঝতে পেরেছে, মহিলাটিকে শাসানো হচ্ছে কেন সে ডাক্তার ডেকে আনল। মহিলাটি বুঝানোর চেষ্টা করছে, যে এই ডাক্তার কীভাবে অনধিকার প্রবেশ করেছে এবং রোগ সম্বন্ধীয় যে অদ্ভুত কথাগুলো বলেছে সম্ভবত সেগুলোও বলল। বৈদ্যের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল। মংওয়াইয়ের বাবা বলল—

আমাগো কোনো ওষুধ লাগব না, আপনে যান।

মানিক শুয়ে থাকা প্রায় অচেতন মংওয়াইয়ের দিকে তাকাল, প্রায় নিষ্প্রাণ মুখ, চোখ পিটপিট করে খোলার চেষ্টা করছে, আগন্তুকের চেহারাটা একবার দেখতে ইচ্ছা করছে তার। কিন্তু পারছে না। মংওয়াইয়ের ছোট বোনটি সব খেলায় ইস্তফা দিয়ে দাদার পায়ের কাছে বসেছে। দাদা ছাড়া তার কোনো খেলা ভালো লাগে না, ছোঁয়াছুঁয়ি খেলায় তাকে কেউ ছুঁয়ে দিলে দাদা আবার তাকে ছুঁয়ে নিজে চোর হয়, তাকে নিয়ে

জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, হাঁটতে না পারলে কাঁধে নেয়, কত রঙের ফুল যে এনে দেয় বন থেকে। রাতে ঘুমানোর সময় গল্পও শোনায়। সে এসব কিছু আর চায় না, তার কাছে থাকা কাচের মার্বেল, সাংগ্রাইয়ের মেলায় বাবার দেয়া দশ পয়সাও সে তার দাদাকে দিতে রাজি কিন্তু তার দাদাকে নদীর ধারে কেউ পুড়িয়ে ফেলুক সে তা চায় না। মানিক দরজার কাছে গিয়ে একবার শুধু বলল—

খুব বেশি সময় নেই, একবার শুধু আমার কথা বিশ্বাস করুন।

বলেই বেরিয়ে গেল, দরজার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা মংওয়াইয়ের মায়ের চোখ দুটো আর দেখতে পেল না সে।

ঝড় হবে মনে হচ্ছে, প্রচণ্ড বাতাস বইছে। জানালার লাগানো পর্দাটি স্থির হয়ে থাকতে পারছে না, উথালপাথাল উড়ে যাচ্ছে। মানিকের ঘরে একটিমাত্র কুপি জ্বলছে, বাতাসের ঝাপটায় একেবারে নিবু নিবু হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিভছে না। আগুনের শিখাটি হেলেদুলে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানিক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আগুনের শিখাটির দিকে। যেকোনো সময় শিখাটি বাতাসের কাছে পরাজিত হয়ে দপ করে নিভে যাবে, কিন্তু মানিক ঠায় বসে আছে। কাল হয়তো আরেকটি শবযাত্রা দেখতে হবে তাকে। এই পাহাড়ের মানুষগুলো খুব সহজ-সরল, তাদের সরলতাই তাদের ধ্বংস করে দিবে। এখানে ফুল সব দেবতার পূজায় ব্যয় হয়ে যায়। প্রেমিকার মাথায় গোঁজার মতো ফুল অবশিষ্ট নেই এখানে। জুমের ফসল বিক্রি করে দিতে হয় দেবতাদের ভোগ চড়ানোর জন্য। তারা ডাক্তারকে বিশ্বাস করে না কিন্তু কবিরাজ আর বৈদ্যদের কাছে সন্তানের প্রাণ তুলে দেয়।

মানিকের ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটে যখন প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটায় কুপিটি নিভে যায়। অলৌকিকতা মানিক বিশ্বাস করে না কিন্তু আগুনের শিখার পরাজয় নিজের পরাজয় মনে হয়, মংওয়াইয়ের ফ্যাকাসে মুখটা ভেসে ওঠে।

হঠাৎ কে যেন ডেকে ওঠে। ঝড়ের সাথে গাছপালার তুমুল যুদ্ধের শব্দটা আলাদা করে সে বুঝতে পারে কেউ তাকে ডাকছে তার ঘরের বাহিরে বাঁশের পাঁচিলে কেউ আঘাত করছে। একটা হারিকেন জ্বালিয়ে ঘরের বাহিরে এসে দেখে বাঁশের দেয়ালের ওপাশে একজন ছোটখাটো মানুষ, তার কাঁধে একটি দেহ। মানিক নিচে নেমে হারিকেন উঁচিয়ে দেখল, মংওয়াইয়ের মা তার দিকে বেদনা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সন্তানের প্রাণের জন্য মায়েরা নিজেদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস সব দূরে ঠেলে দিতে পারেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত একজন মহিলা ডাক্তার ছিলেন, আমেরিকা থেকে এমআরসিপি করে এসেছিলেন। বাংলাদেশের কুসংস্কার নিয়ে তিনি বেজায় বিরক্ত ছিলেন। একটি বইও লিখেছেন, 'আধুনিক চিকিৎসা এবং কুসংস্কার' নামে। সেই বইয়ে তিনি কবিরাজ, দরবেশদের ভণ্ডামি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নিজের ছেলের যখন ক্যান্সার হলো, যখন বিজ্ঞান ব্যর্থ হলো তখন তিনি মাজারে মাজারে ঘুরতে লাগলেন, মানত করতে লাগলেন।

তাবিজ দিয়ে ছেলের শরীর ভরিয়ে ফেললেন, খালি পায়ে ভারতের আজমির শরীফে গেলেন। মনে ক্ষীণ আশা ছিল, যদি কিছু হয়। কিন্তু কিছু হয়নি। ছেলেটি মারা গিয়েছিল। তিনিও আর কখনো প্র্যাকটিস করেননি।

মংওয়াইয়ের মাও সেই ক্ষীণ আশা নিয়ে কবিরাজ ছেড়ে ডাক্তারের কাছে এসেছে, নিজের স্বামী, নিজের বিশ্বাস সব অগ্রাহ্য করে সন্তানের প্রাণের জন্য এসেছে। মানিক ওষুধের বাক্সটি হাতড়ে কুইনাইন ইঞ্জেকশন পেল। সাথে সাথেই পুশ করে দিল। ভাগ্য ভালো ছেলেটি এখনো কোমায় যায়নি। মানিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তবুও মনে মনে প্রার্থনা করছে এই ছেলেটির প্রাণের জন্য।

মাওঝরা পূজায়, দেবতাদের উৎসর্গ করা জবা ফুলে, বৈদ্যের ভূরিভোজের কল্যাণে, অবিশ্বাসী মানিকের প্রার্থনায় অথবা কুইনাইনের জোরে মংওয়াই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। সপ্তাহ দুয়েক পরে একদিন তার ছোট বোনকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসল। মেয়েটির হাতে বেগুনি রঙের ফুল। ছেলেটির হাতে কিছু সজনে ডাটা। সে সজনে ডাঁটার আঁটিটি মানিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, জুমের সজিনা ডাক্তার বাবু। মুই (মা) দিছে।

ছোট মেয়েটি বেগুনি ফুলগুলো তার হাতে তুলে দিল। এত সুন্দর ফুল মানিক আর কখনো দেখেনি। এই সজনে ডাঁটা আর বেগুনি ফুলগুলো তার জীবনের প্রথম উপহার। সারাজীবন মানুষের কাছ থেকে দয়া-দাক্ষিণ্য পেয়েছে, এই প্রথম কোনো উপহার পেল।

মানিক মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—

দেবতার ভোগ আমাকে দিচ্ছিস, দেবতা অভিশাপ দিবে না তো?

মংওয়াই বলল—

ডাক্তার বাবু, মুই কইছে তুই-ই আমাগো দেবতা। তুই আমারে বাঁচাইছস।

মানিক বরাবরই আবেগী, দুঃখ কোনো সময় তার চোখে অশ্রু আনতে পারে না, কিন্তু সুখ পারে। সুখের উপলক্ষ তার জীবনে খুব একটা আসেনি, তাই সামান্য সুখে আবেগী হয়ে পড়ে। চোখের পানি আটকাতে পারে না। তার মতো সামান্য অনাথ মানুষকে দেবতাদের কাতারে ফেলছে এই সহজ-সরল মানুষগুলো, সে একই সাথে লজ্জা এবং সুখ অনুভব করল, চোখ ছাপিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। চোখের পানি লুকানোর জন্যই সে মুখ ঘুরিয়ে নিল, পুরুষ মানুষের অশ্রু সব সময় লুকিয়ে রাখতে হয়। চোখ মুছে মংওয়াইয়ের দিকে ফিরে বলল—

আমি তোকে বাঁচাইনি মং, তোর মুই তোকে বাঁচিয়েছে, তাকে পূজা করিস, সে-ই তোদের দেবী।

সকালে পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মানিক লক্ষ করে, রাতে জমা ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দুগুলো সূর্যের আলোয় চিকচিক করে ওঠে। খালি পায়ে পাহাড়ে যাওয়া পাহাড়িদের পাগুলো ভিজিয়ে দেয়। পাহাড়ে এখন চাঞ্চল্য বেশি, জুমের ফসল কাটা হচ্ছে। পরিবারের সবাই ব্যস্ত, সবাই একসাথে কাজ করছে। সকালের সূর্যে তাদের চোখগুলোও শিশির বিন্দুর মতো চিকচিক করে। জুম বাগানের উপরেই থাকে অস্থায়ী মাচাং ঘর, দুপুরে সবাই একসাথে খায় সেখানে ধূলিমাখা হাতে। কচি বাঁশের তরকারিতেই পাহাড়ের ধুলো মিশিয়ে তৃপ্তি নিয়ে খায় তারা। তারপর আবার নেমে যায় কাজে, রাজ্যের ব্যস্ততা তাতে কিন্তু কোনো ক্লান্তি নেই।

সেই তুলনায় বাঙালি বস্তিতে বিড়ি ফুঁকে অলস দিন কাটাচ্ছে পুরুষেরা। জুমের ফসল কাটা শেষ হলে তাদের ব্যস্ততা বাড়বে। বাঙালি বসতির অধিকাংশই ব্যবসায়ী, তারা জুমের ফসল কিনে শহরে নিয়ে বিক্রি করবে, সেখান থেকে আবার বিভিন্ন জিনিস কিনে নিয়ে এসে পাহাড়িদের কাছে বিক্রি করবে।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে সে এগুতে থাকে টিলার উপর তার কর্মক্ষেত্রে। মংওয়াইয়ের কল্যাণে কিছু রোগী ভিড় করে এখন। তার রুমের বাহিরে বেঞ্চটা মাঝে মাঝে সবার জায়গা দিতে পারে না। নার্স ইয়াসমিন বেড়ানোতে ক্ষান্ত দিয়ে তার কাজে যোগ দিয়েছে—

সে জন্য তার বিরক্তির সীমা নেই। ইয়াসমিনের বয়স মধ্য ত্রিশের আশেপাশে, বিয়ে হয়েছে কিন্তু কোনো সন্তান হয়নি। সন্তানের জন্য নিজেই ঘরে সতীন এনেছে, তিন বছর হলো সেই সতীনও উৎপাদনহীন। ইয়াসমিন জগৎ সংসারের উপর ক্ষেপে আছে এবং তা প্রকাশেও কোনোদিন দ্বিধা করেনি সে, তার মুখে কিছু আটকায় না। সেদিন এক মহিলা রোগী এসেছে লম্বা ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকানো, মানিক কিছু জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয় না। মানিক তখন ইয়াসমিনকে পাঠায়, পাশের ঘরে গিয়ে রোগিনীর সমস্যার কথা জানতে। রোগিনী ফিসফিস করে বলে আর ইয়াসমিন মুখ ভেংচিয়ে জোরে জোরে বলে ওঠে—

ও লো মাসিক হয় না কইতে শরম লাগে?

আজও এক মহিলা বাচ্চাকে নিয়ে এসেছেন, ইয়াসমিন জিজ্ঞাসা করল,

দেখলে তো মনে হয় না অসুখ-বিসুখ হইছে, ডাক্তার সাবের রূপ দেখতে আইছস?

মহিলা বিব্রত হয়ে বলল—

বাচ্চার পায়খানা হয় না।

ইয়াসমিন মুখ বাঁকা করে বলল—

তয় ডাক্তার সাব কি করব? কোঁৎ দিব?

মানিক ইয়াসমিনকে ডেকে বলল—

আপনি নাকি রোগীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন, খারাপ কথা বলেন? কয়েকজন ইলিয়াসের কাছে অভিযোগ করেছে, আমাকেও বলেছে।

ইয়াসমিন তার ঈষৎ স্থূল দেহটা কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে বলল—

কোন গোলামের পুত কইছে, কোন মাগীর ঝি বিচার দিছে? আমি কোনো সময় মুখ খারাপ করছি, এই মিছা কতা কেউ কইলে টান দিয়া জিবলা ছিঁড়া পুটকিতে ভইরা দিমু না!

মানিক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল, কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু তার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

ইয়াসমিনের রাগটা শুধু গর্ভবতী মা অথবা বাচ্চা কোলে নতুন মায়েদের প্রতি। নিজের অপূর্ণতাকে তারা মনে করিয়ে দেয়। সে মা হওয়ার জন্য তার স্বামীকে আবারও বিয়ে করাতে রাজি কিন্তু এত দিনে সে বুঝে গেছে ডজন খানেক বিয়ে করালেও লাভ নেই, তার স্বামীরই গলদ। তার সতীনটা সম্পর্কে কানাঘুষা করে মানুষেরা। রাত-বিরাতে ঘর থেকে বের হয়ে যায় সে। ইয়াসমিন সবই জানে কিন্তু না জানার ভান করে থাকে। একটা সন্তান তার চাই-ই। অবশেষে একদিন তার সতীন এসে বলল, "বুবু তিনমাস হইছে।"

সকাল থেকেই যত রোগী আসছে সবাইকে জিলাপি খাওয়াচ্ছে ইয়াসমিন। সতীনের সন্তান লাভে কেউ এত খুশি হয়? মানিক খুব অবাক হলো, ইলিয়াস তো বলেই ফেলল—

কাউয়ার বাসাত ডিম পাড়লেই কোকিল কা কা করে না।

কথাটা বলেই ইলিয়াস মনে মনে প্রমোদ গুনতে লাগল, আর যাকেই হোক ইয়াসমিনকে এই কথা বলা ঠিক হয় নাই। কিন্তু ইয়াসমিন যেন আজ ভিন্ন মানুষ, সে হেসে বলল—

দুই কোঁটা বীর্যে কেউ বাপ হয় না, নয় মাস পেটে রাখলে মা হওন যায় না, সারাজীবন বুকে যে রাখে সে-ই মা।

মানিক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথাগুলো শুনে, পেটে রাখা মাকে সে চিনে না, বুকে আগলে রাখার মতো মাও তার ছিল না।

বরকত আলী হাসপাতালের সামনে এসে বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, অনেক রোগী বসে আছে। লোকমান কবিরাজের সাথে তার কমিশনের ব্যবসায় ভাটা পড়ার কারণও বুঝতে পারে সে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলিয়াস বরকত আলীকে দেখে সালাম দিল—

আসসালামুয়ালিকুম। কেউ সালাম দিলে বরকত আলীর খুব ভালো লাগে, মনে একটু হলেও শান্তি পেল সে। সালামের জবাব দিতে গিয়ে সে মুখ থেকে পানের পিক প্রায় ফেলে দিচ্ছিল। বরকত আলী চেয়ে দেখল মহিলা রোগীদের সংখ্যাই বেশি। ডাক্তারের সৌভাগ্যে খুব হিংসা হয় তার, ডাক্তাররা নাকি মহিলাদের গায়ে টিপেটুপে পরীক্ষা করে।

ইলিয়াস বরকত আলীকে মানিকের ঘরে নিয়ে গেল, বরকত আলীর মুখে পানের পিক জমেছে অনেক, কথা বলতে পারছে না, জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে পিক ফেলতে গিয়ে শিকে লাগিয়ে দিল, পিক ছিটকে পুরো জানালা এবং জানালার সাদা পর্দা লাল হয়ে গেল। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সে চেয়ারে বসে বলল—

কেমুন আছেন ডাকতর সাব? রোগী তো ভালোই জমাইছেন। কিন্তু সাবধানে থাইকেন, এইখানকার মানুষ খুব খারাপ, ধরেন কেউ রটাইয়া দিব আপনে হাসপাতালে মহিলাদের আজায়গায় কুজায়গায় হাত দেন, ফষ্টিনষ্টি করেন। এক্কেরে জবাই কইরা দিব।

আবার ধরেন পাহাড়ি শান্তি বাহিনী যদি জানে আপনে পাহাড়িগো চিকিৎসার নামে ক্ষতি করতাছেন তারাও ছাড়ব না, চাইর দিক দিয়া বিপদ আইব। আমি আপনেরে ভালো বুদ্ধি দেই, চেষ্টা-তদবির কইরা অন্যখানে যানগা। এইখানে কেউ আপনের বন্ধু না, সবাই শত্রু।

মানিক খুব শান্তভাবে বলল—

শত্রু আমি চিনি, আপনার উপদেশের দরকার নেই। আপনি কী কাজে এসেছেন?

বরকত আলী বলল—

শত্রু আপনে চিনেন না, মনে রাইখেন কথাটা। যাক শফিক স্যারে আমারে পাঠাইছে, থানচি হাসপাতালে আপনের নামে চিঠি আসছে ঢাকা থিক্যা, দিতে আইলাম। আপনের কাজেই আসছি। আর আমার কথাগুলান মনে রাইখেন, কাজে দিব।

ভাঁজ করা একটা খাম দিয়ে বরকত আলী চলে গেল। মানিক হলুদ খামের ভাঁজ খুলে দেখল, প্রেরকের জায়গায় কার্তিকের নাম। চিঠিটি পেয়েই তার মনে হলো, সে এত দিন কীভাবে ঢাকাকে ভুলে ছিল? বংশালের সেই ঘরটি কীভাবে ভুলে থেকেছে? পাহাড় কি তাকে আপন করে নিল নাকি সে পাহাড়কে আপন করে নিয়েছে?

মানিক তার বাঁশের ঘরে শুয়ে কার্তিকের চিঠিটি পড়ছে, ঢাকা থেকে আসা চিঠি।

প্রিয় মানিক,

তোর খবর নেয়ার জন্য আমি চিঠি লিখছি না, আমার খবর দেয়ার জন্য লিখছি। আমি ভালো আছি, আসলে বেশ ভালো আছি। এই বাসায় আসার পর আমি ফার্মগেটের ভিক্ষাবৃত্তির কাজ ছেড়ে দিয়েছি। 'বাচ্চু যাত্রা অপেরা' তে আমি একটা পার্ট পেয়েছি। রহিম রূপবান পালায় আমি তাজেদের সহপাঠী। সংলাপ তেমন নেই, তাজেল যখন রহিমকে ধিক্কার দেয়, তখন

আমরা বলি, ঠিক ঠিক। এতটুকুই। তাজেলকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তাজেল রহিমের দিকেই চেয়ে থাকে। এক ভাম রহিমের পার্ট করে। তার গানের গলা শুনে সবাই মুগ্ধ, কারণ তারা কেউ ফার্মগেটে ভিক্ষুকদের গান শুনেনি কোনোদিন। এই রহিমকে ফার্মগেটে দাঁড় করিয়ে দিলে সারাদিনে এক টাকাও ভিক্ষা পাবে না। ঐ ব্যাটার বয়স কম করে হলেও পঁয়তাল্লিশ হবে। তিনটা বাচ্চা আছে, তবুও তাজেল সেই রহিমের সাথেই হেসে হেসে ঢলে পড়ে। মেয়েটির আসল নাম করিমন। একদিন আমি রহিমের পার্ট করব সেদিন তাজেলরা আমার গায়ে হেসে হেসে ঢলে পড়বে।

যাত্রার অধিকারী বাচ্চু সাহেবের চরিত্রে একটু দোষ আছে, মেয়েদের দিকে তিনি তাকিয়েও দেখেন না, কিন্তু ছেলেদের দিকে একটু ঝোঁক আছে। পঁয়তাল্লিশ বছরের ভামকে দিয়ে বারো বছরের বালকের পার্ট করান, অনেকেই কানাঘুষা করে।

এখন ছুটিতে আছি, শীতকালে আবার চলে যাব তাদের সাথে। তখন এই বাসাটা খালিই থাকবে। আমি অবশ্য পাশের বাসার বৌদিকে বলেছি, তিনি যাতে একটু দেখাশুনা করেন। বৌদি খুব ভালো মানুষ, তিনি না থাকলে আবারও চোখে আঠা লাগিয়ে পথে বসতে হতো। এই বাসায় উঠে প্রথম কয়েক দিন কেরামত মিয়ার হোটেলে খেয়ে জমানো অর্থ সব খরচ করে ফেলেছিলাম। পরে রান্নাঘরে চুলা ঠিক করে ভাত রান্না করতাম আর ডিম ভেজে খেতাম। একদিন বৌদি এসে বাটিতে করে তরকারি দিয়ে গেল। তারপর থেকে প্রতিদিন কিছু না কিছু দিয়ে যায়, আমার শুধু কষ্ট করে ভাত রান্না করতে হয়। নারায়ণ বাবুর বৌ মাঝে মাঝেই এটা-সেটা খুঁজতে আসে, আমি দিতে পারি না। পাশের বাসার বুড়োটা বিকেলে চলে আসে, আমার সাথে বসে বিড়ি টানে আর কাশে। এই বুড়োর মনে হয় কাশতে ভালো লাগে। বৌদির ছেলেটি আমাকে কাকু বলে ডাকে, তাকে প্রতিদিন একটা করে ঘুড়ি বানিয়ে দিতে হয়। এই বাসায় বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে পত্রিকা পড়তে আমার খুব ভালো লাগে, তবুও মাঝে মাঝে মনে হয় কী যেন নেই।

ইদানীং বরই গাছের নিচে একটা কালো দাগ দেখতে পাই, এক কলসি পানি ঢেলেছি, দাগটা যায় না। আমার কেন যেন মনে হয় এটা রক্তের দাগ। বদরুল আলম সাহেব নামে এক বৃদ্ধ এসেছিলেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন শুধু এদিক-সেদিক ঘুরেন। তার সাথে আমার খাতির হয়েছে, আমাকে বললেন, তিনি একটা ফার্মেসি দিবেন, আমি যাতে সেখানে বসি। আমি মানা করে দিয়েছি। তাকে যাত্রা দেখার দাওয়াত দিয়েছি, আমার মনে হয় তিনি যাবেন। তাকে বরই গাছের নিচের দাগের কথা বলতেই তিনি হ্যালুসিনেসন

না কি যেন বললেন। পুত্রশোকে লোকটার মাথা ঠিক নেই। তবুও তাকে আমার ভালো লাগে।

এখন আর লিখব না, ভাতের পানি ফুটতে শুরু করেছে।

ইতি,
কার্তিক ওরফে মহসিন
(যাত্রাপালায় কাজ নেয়ার জন্য মোসলমানদের নাম নিতে হয়েছে, বাচ্চু সাহেব খুব ধার্মিক লোক, হিন্দুদের কাজ দেন না)।

চিঠি পড়া শেষ করে মানিকের মনটা হিংসায় ভরে উঠল, কার্তিকের সব ছিল, সব আছে, তার কিছুই নেই। বংশালের সেই বাসাটা মানিককে কোনোদিন গ্রহণ করেনি, প্রতিবেশীরাও তাকে এড়িয়ে চলত, সে কতবার চেষ্টা করেছে সুধীর বাবুর মতো বরই গাছের নিচে কালো দাগ দেখতে, কোনোদিন পারেনি। কার্তিক কোনো কিছুই গভীরভাবে চায় না, তাই সব পেয়ে যায়।

হিংসা শেষে কার্তিকের জন্য মায়া হলো মানিকের, তার অবস্থাও যদি সুধীর বাবুর মতো হয়? মানিকের কেন যেন মনে হয়, এই ঘরটির একটি পরিবার দরকার। শূন্যস্থান পূরণ করা দরকার।

আজ আকাশটা মেঘলা, সূর্য এখনো উঁকি দেয়নি। আকাশ মেঘলা হলে পাহাড়ের রূপ যেন আরো বেড়ে যায়। বৃষ্টি হতে পারে, বৃষ্টিতে পাহাড় ভিজে যেন আরো রূপবতী হয়ে যায়। মানিকের ছোট্ট হাসপাতালের সামনের জায়গাটাতে বিভিন্ন ধরনের ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটা সূর্যমুখী ফুলও আছে। সেগুলো আজ বিভ্রান্ত, একেকটা একেক দিকে তাকিয়ে আছে। হাসপাতালে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সমস্যা নিয়ে আসে মানুষেরা। একটা দশ-এগারো বছরের ছেলে আসে, কিছুদিন আগে তার বৃদ্ধ দাদা মারা গেছে।

মানিক যখন জিজ্ঞাসা করল 'কী সমস্যা?'

ছেলেটা কাতর হয়ে ছলছল চোখে বলল—

দাদার লাইগা পেট পুড়ে।

মানিক বুঝতে পারল এইসব মানুষদের মন থাকে উদরে। কিন্তু তার কাছে এই রোগের চিকিৎসা নেই, সে নিজেই পেট পোড়া রোগী। ইলিয়াসকে দিয়ে কিছু লজেন্স আনিয়ে দিল। ছেলেটি খেতে খেতে চলে গেল, এরপর থেকে প্রতিদিন এসে বসে থাকে, এখনো তার পেট পুড়ে, দাদার জন্য নাকি লজেন্সের জন্য তা বুঝা যায় না।

কিছু মহিলা আসে সংজ্ঞাহীন, দাঁতে দাঁত লেগে থাকে। স্বামীর সাথে ঝগড়া, অভিমান হলেই তারা মূর্ছা যায়, পানির ঝাপটা দিয়েও তাদের জাগানো যায় না। মানিক সব বুঝে, বিরক্ত হয় না। ইয়াসমিনকে ইশারা দিয়ে চলে যায়। ইয়াসমিন একটু জোর গলায় রোগীর স্বামীকে বলে—

রোগীর অবস্থা তো খুব খারাপ, আপনে করছেন কী?

রোগীর স্বামী অনুনয় করে কাঁদো কাঁদো গলায়, তখন মূর্ছা যাওয়া মহিলার মুখেও কীভাবে যেন মুচকি হাসি ছড়িয়ে পড়ে। ইয়াসমিন তখন বলে,

আর কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান না ফিরলে রোগীর চোখে ইঞ্জেকশন দিতে হবে।

ব্যস কিছুক্ষণের মধ্যেই পানির ঝাপটা ছাড়াই রোগী পিটপিট করে চোখ খুলে, চোখ খুলেই স্বামীর দিকে অবজ্ঞা এবং অভিমান ভরে তাকায়। সেই দৃষ্টিতেও ভালোবাসা থাকে, অনেক গভীর ভালোবাসা।

আজও অদ্ভুত একটা রোগী এসেছে, পাহাড়ি মেয়ে। বয়স পনের-ষোল হবে। পায়ে এখনো মাটি লেগে আছে। জুম ক্ষেতে কাজ করছিল, বিশ্রাম নেয়ার জন্য মাচাং ঘরে গিয়েছিল হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল, মেয়েটার মা গিয়ে দেখল সে পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে।

মানিক ইয়াসমিনকে দেখতে বলল, কোথাও সাপের কামড়ের চিহ্ন আছে কি না। ইয়াসমিন দেখার আগেই মেয়েটার জ্ঞান ফিরে এলো। তার চোখে এখনো ভয়ের চিহ্ন। মানিক বলল—

কী হয়েছিল? কিছু দেখে ভয় পেয়েছ?

মেয়েটা ভীত স্বরে বলল—

তলুঃ তলুঃ

তলুঃ নামটা শুনেই ভয়টা ইয়াসমিন ও মেয়েটার মায়ের চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল। মানিক চোখ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল—

তলু কী?

ইয়াসমিন এই গল্পটা বলার সুযোগ পেলে গলায় একটা ভয়ার্ত ভাব এনে ফেলে, তারপর গম্ভীরভাবে বলে,

স্যার এই গ্রামের নাম আগে বলিপাড়া আছিল না, এই গ্রামের নাম আছিল সেকংজে। অনেক বছর আগে একবার জুম চাষের সময়, এক পাহাড়ি মাইয়ারে ধইরা নিয়া যায় তলুঃ। মারমারা জঙ্গল মানুষরে তলু কয়। অনেক খুঁইজাও সেই মাইয়ারে পাওয়া যায় নাই।

বছরখানেক পর বাঁশ কাটতে গিয়া ঐ মাইয়ারে দেহে কিছু পাহাড়ি, তারা দলবল নিয়া মাইয়ারে নিয়া আসে। মাইয়া আছিল পোয়াতি। মাইয়ার ঘরে একটা পোলা অইল। সেই পোলার গায়ে আছিল তলুর মতন বল। একলগে পঞ্চাশ কাঁদি কলা তুলতে পারত।

বাঙালিরা তহন নৌকা দিয়া জুমের ফসল কিনতে আইত, একবার পাহাড়িগো লগে ঝামেলা লাগল বাঙালিগো। সেই পোলা একলাই বাঙালিগো নৌকা তুইলা পাহাড়ে ছাইড়া দিছিল। পোলার বল দেইখা সেই থেইকা বাঙালিরা এই গ্রামরে বলিপাড়া কয়।

মানিক সব শুনে মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করল—

তুমি কি তলুরকে দেখেছ?

না, পেছন দিয়ে ধরছে, আমি চিল্লান দিছি, আর মনে নাই।

কিছুই মনে নেই?

না, শুধু একটা গন্ধ পাইছিলাম। জর্দার গন্ধ।

মানিক কী মনে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জঙ্গল মানুষ জর্দা দিয়ে পান খায় কি না সে জানে না, তবে একটা জানোয়ারকে সে চিনে, যে জর্দা দিয়ে পান খায়।

শফিক সাহেব চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে সিগারেট খাচ্ছেন। তার রাগ উঠলে তিনি সিগারেট খান। পুরোটা খেতে পারেন না, অর্ধেক খেয়ে ফেলে দেন। তার মুখটা খুব শান্ত দেখাচ্ছে, কিন্তু তার মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে মেজাজ বিচার করা যায় না। খুবই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। বরকত আলী তার সামনে অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। শফিক সাহেব চোখ বন্ধ করেই বললেন—

আমি নারকেল তেলের টিনের কৌটা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম, পরে অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি দিয়েছিলাম। নারায়ণগঞ্জে আমার তিনটা ফ্যাক্টরি ছিল। সবাই বলে আমার ব্যবসায়ের সাফল্য এসেছিল কর্মচারীদের শৃঙ্খলার কারণে। তেরশ কর্মচারীর কেউ একদিনও হরতাল, ধর্মঘট করেনি। আমি সবার খবর রাখতাম, তাই পারেনি। একবার কোম্পানি লসে যাচ্ছিল, আমি দ্বিগুণ বেতন দিয়ে একজন ম্যানেজার রাখলাম। তাকে বললাম, কোম্পানির খরচ যাতে দশ ভাগ কমিয়ে দেয়। সে খুবই দক্ষ এবং শিক্ষিত ছিল—

বিদেশ থেকে পড়াশুনা করে এসেছে, জাপানেও চাকরি করেছে। সে তিন মাসের মধ্যে খরচ পনের ভাগ কমিয়ে আনল। আমি তাকে লাথি দিয়ে বের করে দিয়েছিলাম কারণ আমি চাই আমি যতটুকু বলব ততটুকুই হবে, বেশিও না কমও না।

সিগারেট অর্ধেক শেষ হওয়ার পর বরকতের দিকে এগিয়ে দিলেন, বরকত সিগারেট নিয়ে বাহিরে ফেলে দিয়ে আবার আগের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। শফিক সাহেব আবার বলতে শুরু করলেন—

তোমাকে আমি যে কাজে রেখেছি তুমি সেই কাজ করবা। লোকমান কবিরাজের সাথে কমিশনের ব্যবসা করতে আমি তোমাকে চাকরি দেই নাই, নিজ দায়িত্বে তুমি মানিককে হুমকি দিয়ে এসেছ, তোমার এত বড় সাহস কী করে হয়? তোমার সব কর্মকাণ্ডই আমি জানি। তোমার চরিত্রে দোষ আছে সেটাও জানি। তোমাকেও লাথি দেয়ার সময় হয়েছে কিন্তু তোমার ভাগ্য ভালো আমি কাল মাস দুয়েকের জন্য বার্মা চলে যাচ্ছি। আশা করি নিজের ভালো নিজে বুঝবা। এখন আমার চোখের সামনে থেকে যাও।

বরকত আলী মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল, কিন্তু তার মনে একটুও অনুশোচনা হলো না। মালাউন ডাক্তারটা তার নামে বিচার দিয়েছে চিন্তা করেই মাথায় রক্ত উঠে গেল। কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখল সে, আর একটা দিন, শফিক সাহেব চলে যাক, তারপর সে তার ফণা তুলবে।

সূর্যের আলোতে পাহাড় যেন ঝলমল করছে, কিন্তু মানুষের মুখে মেঘ জমেছে। একটা চাপা গুমোট পরিবেশ। গভীর জঙ্গল থেকে একজন বন কর্মকর্তাকে ধরে নিয়ে গেছে পাহাড়িরা। কোনো মুক্তিপণ দাবি করেনি, তার মানে প্রাণের আশা ছেড়ে দেয়া যায়। পুলিশ এদিক-ওদিক লাঠি নিয়ে ঘুরঘুর করছে, জঙ্গলে ঢোকার সাহস করতে পারছে না। বিডিআর চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না, বড় বড় সংগঠনগুলো অপহরণ করলে তাদের সাথে যোগাযোগ করা যায়, তারাই বিভিন্ন দাবী নিয়ে যোগাযোগ করে। কিন্তু এই ছোট গহিন পাহাড়ের গ্রামভিত্তিক সংগঠনগুলোর কোনো পাত্তা পাওয়ার জোগাড় নেই। তাদের কোনো দাবি নেই, তাদের জঙ্গল নষ্ট করতে যারাই ঢুকবে তারা জীবিত ফিরতে পারবে না। গহিন পাহাড়ে এমন অনেক জায়গা আছে যে সে জায়গা ম্যাপেও নেই। তাই বিডিআরও লাশের জন্যই অপেক্ষা করতে লাগল। সাঙ্গু নদীর পাড়ে কয়েকটা পয়েন্টে পাহারা বসানো হলো। লাশ ফেলতে আসলেই যাতে কিছু লোক ধরা যায়। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিয়েও কাউকে ধরা গেল না, লাশ ঠিকই ভেসে এলো নদীতে। মাথা ছাড়া লাশ।

থানচি বাজারের পাশে বিডিআর ক্যাম্পে রাখা হয়েছে লাশ, লাশ দেখতে লোকজন ভিড় করছে। চায়ের দোকানে বিক্রি বেড়ে গেছে। চায়ের চুমুকে চুমুকে লাশ ভেসে আসার বিচিত্র কাহিনি তৈরি হতে লাগল। লাশ নিয়ে নাকি পাহাড়ি চারজন সুন্দরী পরী এসেছিল।

তাদের শরীরে কোনো কাপড় ছিল না। বিডিআর-এর লোকজনের সামনে দিয়ে তারা নদীতে লাশ ভাসিয়েছে কিন্তু তারা একটুও নড়তে পারেনি। লোকজন লাশের চেয়ে সেই পাহাড়ি পরীদের দিকেই বেশি মনোযোগ দিত। তাদের শরীরের বর্ননা শুনার জন্য বারবার একই গল্প শুনতে লাগল, নিজের মনমতো বাড়িয়েও বলতে লাগল। একসময় নিজের বাড়িয়ে বলা অংশও তারা সত্য মনে করতে লাগল : বরকত আলী চায়ের আসরে মধ্যমণি হয়ে বসেছে। পাহাড়ি পরীদের রূপ বর্ণনায় সে যোগ দিল। কিন্তু মানুষের লোভের সাথে সাথে স্কোভটাও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সে কথার সুর কেটে সবাইকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করল।

যে মানুষটারে খুন করছে তার নাম কি জানেন?

সবাই মাথা নাড়ল, কেউ জানে না। সবাই নীরব হয়ে বরকত আলীর উত্তর শোনার অপেক্ষায় রইল। সে গলা উঁচু করে বলল,

তার নাম মোহাম্মদ আব্দুর রহমান। জি হ্যাঁ মোসলমানের ব্যাটা ছিল। এই জন্যই তার এই পরিণতি। যদি মালাউন, পাহাড়ি হইত তাইলে বাইচ্চা যাইত। দেখেন না কোনো সরকারি অফিস্যার এইখানে টিকতে পারে কিন্তু বলিপাড়ায় এক মালাউন ডাক্তার ঠিকই আরামে আছে। তাগো আসল ঝাল হইল আমাগো মোসলমানগো উপর। মোসলমান যেইখানে গেছে রাজত্ব করছে, এই পাহাড়েও মোসলমানগো রাজত্ব হইব, আল্লার রাজত্ব হইব।

সবার বুক কেঁপে ওঠে, গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। মনের ভেতর মোহাম্মদ আবদুর রহমান নামটা বারবার প্রতিধ্বনি হতে থাকে, আর সাথে সাথে ক্ষোভও বাড়তে থাকে। বরকত আলীর প্রতিটি কথা তারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে লাগল। বরকত আলী আবার শুরু করল,

আল্লাহ আমাগো বান্দাগো কত সুযোগ-সুবিধা দিছে, আমরা আল্লাহর হুকুম পালন করুম, বিধর্মীগো ভয়ে তার বান্দারা পলাইব না। তারা একটা লাশ ফালাইলে আমাগো দশটা লাশ ফালাইতে হইব। দরকার হয় জান দিয়া দিব আল্লাহর রাস্তায়।

শেষের বাক্যটা সবার বুকে ধাক্কা দেয়। ইচ্ছা করে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটা ক্ষোভের গুঞ্জন ওঠে। বরকত আলী গলা নামিয়ে বলল।

সবুর করেন ভাইয়েরা। আপনেরা এক জোট হন, আইজকা সন্ধ্যায়ই হবে ইনশাহল্লাহ। বলিপাড়ায় সব হারামি বিধর্মীরা থাকে, কিছু করতে হইলে আগে সেই জায়গায় ব্যবস্থা নিতে হইব।

সবার চোখগুলো জ্বলজ্বল করতে থাকে, মনে মনে চাপা উত্তেজনা যেন চোখ দিয়ে ঠিকরে বের হয়। বরকত আলী এক দফা সবার দিকে তাকিয়ে আবার চায়ে চুমুক দেয়, বড় ভালো হয়েছে চা-টা।

সন্ধ্যা হয়েছে অনেক আগে। বাঙালি-পাড়ার পুরুষেরা আলস্যে বিরতি দিয়ে ঘরে ঝিমাচ্ছে। কেউ কেউ ব্যবসার হিসাব মিলাচ্ছে। মারমা পাড়ায় ক্লান্তি, ফসল তুলে শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছে অনেকে। সারাদিন মাঠে কাজ করা নিজের মেয়ের চুলে চিরুনি দিচ্ছে তার মা, চুলের বন্ধন আলগা করতে পারে না সে চিরুনি। মেয়েটি মারমা ভাষায় মাকে আহ্লাদের অনুনয় করে, তার কিছুটা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে মানিকের কানেও আসে। ঘরের নিচে বাঁধা শূকরগুলো মাঝে মাঝেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে।

ফিসফাস করে বলা গল্পগুলো মানিকের কানে আসে না, বুড়ো দাদুরা তলুংয়ের গল্প করেন, ঘুমে চোখ বুজে আসা ছোট খোকাটি কষ্ট করে জেগে থাকে দাদুর গল্প শোনার জন্য। নীরব সুরে জীবনের গান বেজে যায় পাহাড়ের কোলে। তার মধ্যেই ফসল

তোলার খুশিতে 'রা' খেয়ে মাতলামি করতে থাকে এক বৃদ্ধ। সে তার ভাষায় চেঁচায়, কিছু বুঝতে পারে না মানিক, তবে শুধু তলুঃ শব্দটা বুঝতে পারে।

মানিক ভাবল, এবার ফেরা যাক। সবাই তাকে বারণ করেছে এখানে বেশিক্ষণ না থাকতে। ভূত, প্রেত, তলুঃ সবার নাকি একযোগে সমাগম হয় রাত্রিবেলা। দিনের বেলায় তাদের বড্ড অসুবিধা। বিশাল আকারের তলুঃ কিংবা ভূত-প্রেতের সমাগমে মানিকের কোনো ভয় নেই, গাঙ দেবতাদের স্বরণ করলে নাকি তারা কিছু করে না, ভূত প্রেত তাড়ানোর জন্যও আলাদা দেবতা নিযুক্ত আছেন। সে ভয় পায় ফুট তিনেকের বন্য শূকরকে। এই জিনিস আক্রমণ করলে কোনো দেবতার দোহাই দিয়ে পার পাওয়া যায় না।

পাহাড়ি রাতের সুর কেটে একটা মৃদু কোলাহল শোনা গেল, যেন বহু দূরে কোনো সমুদ্র ঢেউয়ের আস্ফালন। ক্ষেপে তেড়ে আসছে। আস্তা কাঁপানো সেই কোলাহল বাড়তে থাকল। পাহাড়ের উপর থেকে মানিক দেখল, সাপের মতো ফণা তুলে এক বিশাল ছায়া রাতের নীরবতা ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে মারমা পাড়ার দিকে। এরাই সে তলুঃ আসল দানব। এক দল মানুষের এক হিংস্র মিছিল। আছড়ে পড়ল মারমা পাড়ার প্রথম ঘরটাতে। তারপর আরেকটাতে, সংক্রমনের মতো ছড়িয়ে পড়ল। একটা চিৎকার ছাপিয়ে গেল আরেকটা চিৎকারকে। চিৎকারগুলো আর্তনাদে রূপ নিল। মানুষ ছুটতে লাগল দিগ্বিদিক, একটু আগে চিরুনির ছোঁয়া পাওয়া চুলগুলো আবার এলোমেলো হয়ে গেল, দানবের হাত তার চুলের মুঠো ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, প্রাণপণে নিজের শরীরে খামিটি জড়িয়ে রাখতে চাইছে মেয়েটি। ফসলের খাড়িটি দুই হাতে জড়িয়ে রেখেছে কেউ একজন, সবাই পালাচ্ছে সে পালাচ্ছে না। সেই খাড়িতে তার রক্ত ছিটিয়ে পড়ল একটু পর। তলুঃর গল্প শুনে ঘুমিয়ে পড়া ছেলেটি উদ্ভ্রান্তের মতো তার দাদুকে খুঁজে ফিরছে। নিজের কোল থেকে হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাটি খুঁজছে কোনো এক মা, সে ক্রমাগত ডেকে চলেছে, 'ও বু, ও বু'। মাতাল লোকটি আর চেঁচাচ্ছে না, কেউ একজন তার মাথাটা আলাদা করে ফেলেছে শরীর থেকে।

আর্তনাদগুলো কমে গেল, মাঝে মাঝে দুই-একটা আর্তনাদ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। একটু পরে পুরো পাহাড় আলোকিত হয়ে গেল, একটার পর একটা ঘর জ্বলতে থাকল। জুমের ফসলগুলো আগুনে আত্মাহুতি দিল। উল্লাস করা দানবেরা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাঙালি পাড়ার পুরুষেরা আলসেমি কাটিয়ে তাদের প্রতিবেশী মারমাদের ঘরের আগুন নিভাচ্ছে। মারমারা দুই-একজন জঙ্গল থেকে সাহস করে বেরিয়ে এসেছে, ঘর, ফসলের মায়ায়। মানিক পাহাড়ি রাস্তাটার মাঝামাঝি এসে দেখল, বাঙালি পাড়ার মধ্যে একমাত্র তার ঘরেই আগুন জ্বলছে। আগুন বেশি লাগতে পারেনি মানুষ বালি ছিটিয়ে অনেকটাই নিভিয়ে ফেলেছে। মানিক অবাক হয়ে দেখল মংওয়াইয়ের বাবা-মা নিজদের ঘর ছেড়ে তার ঘরের আগুন নিভাচ্ছে।

আগুন একসময় নিভে গেল, রাতও পার হলো, কিন্তু দগ্ধ ঘরগুলোর মতো মানুষের মনেও কালো ক্ষত হয়ে গেল। পোড়া কাঠ থেকে তখনো থেকে থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। নিজের ঘরে এসে চোখের পানি ফেলছে ছেলে হারানো মা, তার চোখের পানি জ্বলন্ত কাঠে পড়ে ছপ করে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। অশ্রুগুলো বাষ্প হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল মেঘের সাথে। সেগুলো আবার বৃষ্টি হয়ে একদিন তাদের ঘর পোড়া ছাই মুছে দেবে। ছয়টা মেয়ে নিখোঁজ ছিল, দুই জনের লাশ পাওয়া গেছে, দুটোই নগ্ন। এখনো চারজনের কোনো খোঁজ নেই, তাদেরও লাশ খোঁজা হচ্ছে। হাতে থান কাপড় নিয়ে লাশ খোঁজা হচ্ছে, তারা জানে বাকি লাশগুলো নগ্নই হবে।

নারী-পুরুষ মিলিয়ে আটজনের মৃতদেহের সৎকার করা হলো। ঘর পুড়ে যাওয়া কাঠ দিয়েই তাদের পোড়ানো হলো। মানিক পাহাড়ের ঘাসে গা এলিয়ে বসে আছে। দূর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়ছে, আটটা কুণ্ডলী। মারমা পাড়াটা দেখতে কালো কোনো মৃত্যুপুরীর মতো লাগছে। মহিলারা এখনো থেমে থেমে বিলাপ করছে।

দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি মানিকের, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সন্ধ্যাটা কালো চাদর বিছাতে শুরু করেছে। পাহাড়ের ঢালুতে কিছু ঝোপঝাড় বাড়াবাড়ি রকমের ঘন হয়ে গেছে। সেই ঝোপটাই যেন হঠাৎ নড়ে উঠল। মানিক সংশয়ে তাকাল, কী আছে ঝোপের আড়ালে? তলুঃ নাকি শূকর? তলুতে ভয় নেই মানিকের, সেই জঙ্গল মানুষের আগ্রহ শুধু কুমারী মেয়েতে, সে তা নয়। ঈশ্বর তাকে এই কৃপাটুকু করেছেন। কৌতূহলটাকে মাটি চাপা দিয়ে সে উঠে চলে যেতে পারল না। এক পা দু পা করে এগিয়ে গেল ঘন ঝোপের কাছে। গুল্মের অবাধ্য ঝাড়টা সরাতেই আবছা আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেল, মানুষ। জঙ্গল মানুষ নয়, এ যে মানবী, নাকি দেবী? লম্বা চুল দিয়ে মুখটা ঢাকা, কাত হয়ে পড়ে আছে ঘাসের উপর। ঘাড়ের কাছে কালচে জমাট বাঁধা রক্ত প্রমাণ দিল যে, এই নারী অমানুষ নয়। মানিক অভ্যস্ত হাতে মেয়েটার হাত ধরে পালস চেক করতে গিয়ে যেই হাতে স্পর্শ করল, মেয়েটার শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠল, এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, চুলের আড়াল থেকে মানিকের দিকে তাকাল, তার চোখে ভয়, ঘৃণা, অসহায়ত্ব মিশে ছিল। বেশিক্ষণ চোখ খুলে রাখতে পারল না, আবার এলিয়ে পড়ল।

মেয়েটি চোখ খুলে ঘোলা ঘোলা চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছে। তার ঘোর এখনো কাটছে না। ঘাড়ের কাছে ব্যান্ডেজ অনুভব করল সে, সাথে একটু ব্যথা। ছিমছাম ছোট একটা ঘর কিন্তু অপরিচিত, বাঁশের খুটিতে একটা হারিকেন জ্বলছে। কয়েকটা শার্ট আনমনে ঝুলে আছে এক কোনায়, টেবিলে বেশ কিছু বই গুছানো আছে, এই ঘরে একমাত্র সেগুলির যত্ন হয়। ঘরটা দেখে বুঝা যায় এটা কোনো পাহাড়ির ঘর না। মুহূর্তে ভয়ে-শঙ্কায় কুঁকড়ে উঠল মেয়েটি। তখনি মানিক ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে শঙ্কাটা আরো বৃদ্ধি পেল মেয়েটার। মানিক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে উচ্ছল ভঙ্গিতে বলল—

আর একটু হলেই মরতে।

মেয়েটি সন্দেহের দৃষ্টি অব্যাহত রাখল, গায়ের চাদরটি আঁকড়ে ধরল। মানিক তা লক্ষ করে বলল—

তোমাকে পাহাড়ের ঢালুতে পেয়ে আমার ঘরে নিয়ে এসেছি, রাত হয়ে গিয়েছিল। তোমাকে কোলে করে হাসপাতাল পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়নি। মেন্টাল ট্রমা আর ব্লিডিং-এর কারণে সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিলে। কয়েক দিন বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

মেয়েটি যেন বিভ্রান্ত, হয়তো অনেক কিছু মনে করার চেষ্টা করছে। হঠাৎ চোখের তারাটা জ্বলে উঠল, আর মুহূর্তেই চোখ ছেপে জল গড়িয়ে পড়ল। মাথা গুঁজে দিল দুই হাঁটুতে। মানিক কাছে যেতেই আবার মাথা তুলল। মানিক কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না, সে কখনোই সান্ত্বনা দিতে পারে না। নিজের এই অক্ষমতার জন্য বড্ড অসহায় লাগছিল। কিন্তু কিছু একটা বলা দরকার। কথা শুরু করার জন্যই বলল,

তোমার নাম কী?

তখনি মেয়েটি স্পষ্ট বাংলায় বলল—

প্লিজ আপনি আমার কাছে আসবেন না। এখান থেকে যান।

পাহাড়ি মেয়ের মুখে বাংলায় এমন স্পষ্ট উচ্চারণ শুনে মানিক একটু হতচকিত হয়ে গেল। মেয়েটির গলায় গাম্ভীর্য ছিল, আত্মসম্মান ছিল, আদেশও ছিল যা মানিকের পক্ষে এড়ানো সম্ভব ছিল না। মানিক কিছু না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মানিক চলে যাওয়ার পরই মেয়েটির যেন একটু অনুশোচনা হলো। কিন্তু এত বড় দুর্যোগের পরে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। লোকটিকে বেশ ভদ্রই লাগছিল, সারারাত সে এ ঘরেই ছিল, কোনোরকম বিদ্রোহ করার শক্তি তার গায়ে ছিল না, তবুও লোকটি তাকে কিছু করেনি। ভোরের আলো আর জোছনার আলোর মধ্যে মিল আছে, দুটোই স্নিগ্ধ কোমল। কিন্তু ভোরবেলা যত পাখির ডাক শুনা যায়, জোছনায় ততটা শোনা যায় না। তার বাবা এই সময়টাতে সব সময় ঘর থেকে বেরিয়ে যেত আর সে জানালা দিয়ে দেখত। আজও সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। আবছা আলোতেই বুঝল, এটা বলিপাড়া গ্রাম। এই পাড়ার প্রতিটা ঘাস তার মুখস্থ। জানালা দিয়ে ছোট পাহাড়ের অর্ধেকটা দেখা যায়। সেই পাহাড়ের পাশ দিয়ে মানুষ হাঁটার রাস্তা তৈরি হয়েছে, মানুষ সেই পথ ধরে হাঁটে, তাই ঘাসগুলো পথ দখল করতে পারেনি, লালচে সেই পথ ঘাসগুলোর ব্যর্থতা আর মানুষের নিয়মিত চলাচলের সাক্ষী দেয়। মেয়েটি দেখল, ভোরের আলোতে সেই পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে একটি লোক, যার ঘরে সে আশ্রিত। হঠাৎ যেন লোকটিকে দেখে তার বাবার কথার মনে হলো। লোকটি তার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল কিন্তু সে উত্তর দেয়নি, এখন মনে মনে উত্তর দিল—

আমার নাম ক্রাসিমা।

ক্রাসিমা সেই চারজন নিখোঁজদের মধ্যে একজন। মানিক যদি এখানের চায়ের দোকানগুলোতে ঘুরঘুর করত ক্রাসিমার নাম অবশ্যই শুনত। মানুষজন গল্প করার সময় দ্বিধায় ভুগত, তার রূপের প্রশংসা করবে নাকি গুণের। পাহাড়িদের মধ্যে একমাত্র

সেই-ই কলেজে পড়তে গেছে। পাহাড়ি বৃদ্ধরা গর্ব করে তাকে নিয়ে আর তরুণেরা স্বপ্ন দেখে, দেবতাদের অবহেলা করে ক্রাসিমার জন্য মালা গাঁথে, সেই মালা তাদের দেবীর চরণে অর্পণ করার সাহস কারো হয় না। তবুও তারা মালা গাঁথে, স্বপ্ন দেখে, পূজা করে কিন্তু অশ্রদ্ধা করতে পারে না, অভিশাপ দিতে পারে না। তার বাবার কথা বলার সময়ও লোকজনের মন আর্দ্র হয়ে যায়। যুবক বয়সেই বউ মারা যায় ক্রাসিমার বাবার। লোকে বলে ক্রাসিমার রূপ তার বাপ থেকেই পাওয়া। তরুণীরা আশায় বসে ছিল ক্রাসিমার মা হওয়ার জন্য। কিন্তু ক্রাসিমার বাবার মনে সায় দেয়নি, তরুণীরা দীর্ঘশ্বাসকে সঙ্গী করে অন্য কারো বউ হলো। বলিপাড়ার কার্বারী (গ্রাম প্রধান) ছিল ক্রাসিমার বাবা। সব পদে ইস্তফা দিয়ে শুধু বাবার পদটা ধরে রেখেছিল সে। ছোটবেলায় ক্রাসিমাকে খুব কম লোকই হাঁটতে দেখেছে, তার বাবা তাকে সব সময় ঘাড়ে করেই রাখত। বাপ-মেয়ে সকাল বিকাল পাহাড়ের কোলে বসে থাকত, তাই লোকজন ক্রাসিমাকে 'পাহাড়ের মেয়ে' ডাকত।

ক্রাসিমা যখন বান্দরবান কলেজে ভর্তি হলো, তখন তার বাবাকে ছাড়া যাবে না বলে গো ধরে ছিল। সে বলেছিল—

তোমাকে ছাড়া কীভাবে থাকব বাবা! আমি টিকতে পারব না।

তার বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল দেখ—

তুই পাহাড়ের মেয়ে, তুই সব জায়গায় টিকে যাবি। আমি তোর সাথে যেতে চাই কিন্তু এই পাহাড় ছেড়ে যেতে পারব না। আমি এই পাহাড়ে জন্মেছি, এখন বুড়ো হয়ে গেছি, কখন ঈশ্বর ডেকে নেন ঠিক নেই। আমি এই পাহাড়েই মরতে চাই।

একটু থেমে আবার বলেছিল—

মাগো যাই করিস, এই পাহাড়ে ফিরে আসিস। এই লোকগুলো বড় সরল, তাদের দেখিস তুই। তাদের জন্য কিছু করিস মা।

এই আকুতিটা ক্রাসিমা কখনো ভুলতে পারে না। তার কানে বাজে এই কথাটা।

গত রাতের কথা মনে আতঙ্ক ধরিয়ে দেয় ক্রাসিমার। জেগেই ছিল সে, বাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রতিবার এসে সে তার বাবার জন্য একটা বিশেষ রান্না করে, অতি কুখাদ্য হলেও তার বাবা চেটেপুটে খায়। বাঁশের চোঙ্গায় পাহাড়ি মাশরুম রান্না করেছিল গতকাল। ব্যাঙের ছাতা মানুষ খায়, এই কথা বিশ্বাস করাতে অনেক কষ্ট হয়েছে ক্রাসিমার। ব্যাঙের ছাতার ব্যঞ্জনার ভয়েই হয়তো সন্ধ্যাবেলায়ই বেরিয়ে গেল তার বাবা। ক্রাসিমা অভিমানে অপেক্ষা করছিল বাবার জন্য, ঠিক করেছিল, বাবা আসলে তাকে যখন ডাকবে সে সাড়া দিবে না।

শান্ত পাহাড়ে হঠাৎ চিৎকার শুনে আঁতকে উঠেছিল সে। কিছু বুঝার আগেই দুটি বাঙালি লোক দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল। অপরিসীম হিংস্রতা ছিল তাদের চেহারায়, মশালের আলোতে তাকে দেখে সে হিংস্রতা যেন লালসায় রূপ নিল। এই রূপ ক্রাসিমা চেনে, সে জানালা দিয়ে মাঁচার উপর লাফ দিয়ে পড়েছিল, বাঁশের কঞ্চিতে লেগে ঘাড়ের কাছে অনেকটা কেটে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা সে টের পায়নি। শুধু দৌড়েছে

যতক্ষণ গায়ে শক্তি ছিল, চারিদিকে চিৎকার ভেসে আসছিল, সেও চিৎকার করছিল, বাবা বাবা করে।

কোন সময় পড়ে গিয়েছিল বলতে পারে না। দিনের আলোতে একবার জ্ঞান ফিরেছিল কিন্তু দুর্বলতার জন্য হোক আর ভয়ে হোক সে নড়তে পারেনি। সে ধরে নিয়েছিল মারা যাচ্ছে, বাবার কথা মনে হচ্ছিল বারবার।

ক্রাসি ও ক্রাসি, ক্রাসি

হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠত বাবার ডাক শুনে। জেগেই কান পেতে রইত কিন্তু বাবা যে আর ডাকে না। দেবতার নাম করে বাবাকে দিব্যি দিয়েছিল—

বাবা একবার ডাকো, একবার।

সেই ডাক শোনার অপেক্ষায় বুঝি প্রাণটা দেহে ধরে রেখেছিল। তারপর এই লোকটাই তাকে বাঁচাল। ঘর দেখে বুঝা যায় লোকটা ডাক্তার। কিন্তু এই বলিপাড়ায় একজন ডাক্তার বসবাস করে, ভাবনাটা বড্ড বেশি অযৌক্তিক।

ভাবনায় ছেদ ঘটলো কিছু শব্দে। মনে হচ্ছে এই ঘরের বাহিরে কিছু মানুষ ভাংচুর করছে। ক্রাসিমা বিছানার চাদর মুঠো করে ধরে সচকিত হয়ে দরজার দিকে তাকাল। তার ঘরের দরজাটা খুলে গেল। একসাথে বেশ কয়েকজন লোক ঢুকল ঘরে।

মানিক নার্স ইয়াসমিন আর মং-এর মাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিল, মেয়েটা ট্রমায় আছে, কোনো বাঙালিকে বিশেষ করে পুরুষ বাঙালিকে হয়তো বিশ্বাস করতে পারছে না। তারা ঘরে ঢুকতেই দেখল দরজাটা উপর থেকে খুলে একদিকে ঝুলছে, ঘরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, হারিকেনটা আহত হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে, মোরগ হওয়ার শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের মতো উলটে আছে চেয়ার দুটো। কাপড়-চোপড় আর ওষুধগুলোকে কান টেনে হিড়হিড় করে বের করে আনা হয়েছে ড্রয়ার থেকে, সেগুলো হতবাক হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে। কেরোসিনের ঝাঁঝালো গন্ধ বাতাসে, মেঝে সিক্ত সেই তরলে। কিন্তু যে ঘরটাতে মেয়েটা ছিল সেখানে এই তাণ্ডবের বিন্দুমাত্র নেই। সব কিছু যেমন ছিল তেমনি আছে, শুধু মেয়েটা নেই। চাদরটা একটু খুলে আছে খাট থেকে, সেখানে এখনো ক্রাসিমার গন্ধ লেগে আছে কিন্তু ক্রাসিমা নেই।

তিনজন মানুষের হতবাক চাহনি ঘরে ঘুরাঘুরি করছিল। তারা নিজেদের ধাতস্থ করার আগেই হাশেম ঘরে ঢুকল, সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—

লাশ পাওয়া গেছে।

মানিক নিঃশ্বাস আটকে বহু কষ্টে জিজ্ঞাসা করল—

কার?

বরকত ভাইয়ের, গলাকাটা লাশ।

বিলাপ স্বল্পস্থায়ী কিন্তু কান্না দীর্ঘস্থায়ী। বলিপাড়ার মারমা পাড়ায় এখন আর বিলাপ শোনা যায় না, মাঝে মাঝে কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে শুধু। কালো ছাই রং পোড়া বাড়িঘর মেরামতে লেগে গেছে সবাই। অনেকে ঘরের ছাই ফেলে রেখে, জমি-জিরাত ছেড়ে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। বাঙালি সুদের কারবারিদের উদ্ভব ঘটেছে। এরা শকুনের মতো লাশের গন্ধ পেয়ে ঠিক চলে এসেছে। চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ঘর তুলছে পাহাড়িরা, জুমের ফসলের পুরোটাই বেচতে হবে আগামীবার, জুমও আগের মতো করা যায় না, বন কর্মকর্তারা এসে বাগড়া দেয়, ফসল নষ্ট করে দিয়ে যায়। সব জুম মহাজন নিলে তারা কী খাবে তবে অ নিয়ে চিন্তা করে কিন্তু উপায় খুঁজে পায় না। উপায় একটা আছে অবশ্য, যারা ভিটে ছেড়ে চলে যায়, তারা যোগ দেয় জেএসএস, ইউপিডিএফ অথবা পহিন জঙ্গলের কোনো সংগঠনে। সেখানে খাওয়া পরার কোনো কমতি নেই, শুধু প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে হবে, তবুও ভালো, প্রাণ যে এখানে খুব একটা নিরাপদ তাও নয়। অন্তত বউ-মেয়েকে কেউ অত্যাচার করে মেরে ফেলবে না, থান কাপড় নিয়ে তাদের লাশ খুঁজতে হবে না।

রং ফিরতে থাকে ধীরে ধীরে মারমা পাড়ায়, ছোপ ছোপ কালো রং কিছু রয়ে যায়, যারা জঙ্গলে চলে গিয়েছে তাদের হিসাবটা যেন এই কালো পোড়া বাড়িগুলো দেখেই বের করা যায়। বাকি ঘরগুলো কাঁচা-পাকা বাঁশ আর খড়ের বাদামি রঙে ছেয়ে যায়। তার মাঝেই হঠাৎ হঠাৎ দুই-একটা কান্না ভেসে আসে। গত বর্ষার আগে বুড়ো চিংমাই ছেলেকে সাথে নিয়ে ঘর মেরামত করেছে, এই বছর ছেলের বিয়ে দিবে ঠিক করেছিল। ছেলে ছন, বাঁশ এগিয়ে দিত, চিংমাই তা দিয়ে নিজের ঘর আরো পোক্ত করত ; এখন আবার ঘর বাঁধছে সে, মাঝে মাঝেই মনের ভুলে ছেলের নাম ধরে ডাকে, হাত পাতে ছনের জন্য। তারপর ডুকরে কেঁদে ওঠে।

এত শোকের মাঝে ক্রাসিমার কথা কালেভদ্রে মনে আসে মানুষের। ক্রাসিমার বাবাও মৃতদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছিল, এই নিরীহ বাবাকেও অনুকম্পা করেনি ঘৃণায় মত্ত হিংস্র মানুষগুলো। প্রাণ যাওয়া পর্যন্ত তার ক্রাসিকে ডেকেছে। কেউ কিছু বলে না কিন্তু মনে মনে সবাই ক্রাসির একটাই পরিণতি ভেবে রেখেছে। সে ভাবনা

কেউ প্রকাশ করে না, আবার যদি দুর্মুখের অপবাদ দেয় কেউ। কিন্তু মানিক ভুলতে পারে না, পাহাড়ের সেই ঝোপটার কাছে গিয়ে বসে থাকে। নিজেকেই দোষারোপ করে সে। তার মনে দাগ কেটে যায় অপরাধবোধ, নাকি সেই ঘৃণা ভরা দৃষ্টি, সে বুঝতে পারে না। শুধু জানে ক্রাসিমা নামক মেয়েটা তাকে একটা অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে, সেই অস্বস্তির কারণ অনুসন্ধান করে খুঁজে পায় না সে।

দুর্যোগ বিপদে দেবতাদের সমাদর বেড়ে যায়। দেবতাকে তুষ্ট করতে ভোগ চড়ানো হয়, দেবতার তাতে মনঃপূর্তি হয় কি না না জানা গেলেও পুরোহিত মশাইয়ের উদরপূর্তি ঠিকই হয়। ক্রাসিমার হারিয়ে যাওয়াতে দেবতারাও হয়তো তুষ্ট হবেন, তাদের ভাগের পূজার ফুল তারা আবার অধিকার করে নিয়েছেন। মারমারা নিজেদের দায়ভার, দায়িত্ব সব দেবতার উপরে চাপিয়ে একটু নির্ভার হলো। কান্নার পাশাপাশি মাঝে মাঝেই হাসি শোনা যায় মারমা পাড়ায়। হেসেই যেন অনুশোচনায় ভোগে, অনুশোচনা ভুলে আবার হয়তো হাসে।

এভাবেই ক্ষত শুকাতে থাকে কিন্তু ঘৃণা শুকায় না, তা বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে বহুগুণে।

আশেপাশে ফিসফাস শব্দগুলো বিগত দুর্যোগের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত, আর আসন্ন দুর্যোগের ভবিষ্যদ্বাণীও হয় ফিসফাস গলায়। বরকত আলীকে শান্তি বাহিনী মেরেছে কথাটায় খুব বাতাস লেগেছে। শফিক সাহেব ফিরে এসেছেন কিন্তু তিনি কোনো কেইস করেননি। থানার দারোগার সাথে তার দহরম-মহরম। বিডিআর, আর্মিতেও বেশ জানাশোনা। কিন্তু তিনি নির্বিকার, তিনি বলেন, 'যার কর্ম তার ফল' মানিক সেই ফিসফাসগুলো এড়িয়ে চলে। পাহাড়কে সে মনে ধারণ করেছে, এখানে কূটচালের গন্ধ খুঁজতে তার ভালো লাগে না। এই নির্মল এলোমেলো বয়ে চলা বাতাসে সে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পায় না, বরং গহিন পাহাড় থেকে আসা কোনো এক বুনো ফুলের সুবাস পায় সে। ঝরনা দিয়ে বয়ে চলা টলটলে পানিতে কোনো কলুষতা নেই, পাহাড়ি শিশুদের গা ভিজিয়ে তারা বয়ে যায় আপন মনে। পাহাড়ের বুকে জুম ফলে, মাতৃদুগ্ধ স্তনের মতো বুক চিরে খাওয়ায় সে। কিন্তু কতজন হতে পারে পাহাড়ের সন্তান। যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে তারাই ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খাচ্ছে পাহাড়কে।

মানিক যেন নিজের পরিচয় খুঁজে পায়, এই পাহাড়ে সবচেয়ে বড় পরিচয়, পাহাড়ের সন্তান। কিন্তু মানিকের অন্য বাস্তব জীবন মানিককে এত সহজে ছেড়ে দেয়নি। তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেছে সেখানে, যেখান থেকে সে শুরু করেছিল। নতুন পাতানো পরিচয়ের আত্মতৃপ্তি মুছে দিয়েছিল এক লহমায়, একটিমাত্র চিঠিতে।

হাশেমের হাতে চিঠিটি, মানিককে এগিয়ে দিল। কার্তিক কি আবার চিঠি লিখল, ভাবতে ভাবতেই চিঠিতে প্রেরকের নামটি দেখে একটু আশ্বস্ত হলো, চন্দনবাবু চিঠি পাঠিয়েছেন। আশ্রমে বোধ হয় কিছু প্রয়োজন। কেউ মানিককে প্রয়োজনে স্মরণ করলে তার ভালো লাগে কারণ প্রয়োজনে প্রিয়জনদের কথাই মানুষ মনে করে। ভাতের আঠা দিয়ে মুখ বন্ধ করা খামটির। মানিক একপাশটা যত্ন করে ছিঁড়ল। চন্দনবাবুর লেখা

অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গুটি গুটি অক্ষরে চিঠিটি নিতান্ত আনমনে পড়া শুরু করল সে। কিন্তু একটু পড়তেই অক্ষরগুলো একটার সাথে সাথে আরেকটা মিলে মানিকের চোখে যেন ঝড় তুলে দিয়েছিল। ছিন্নভিন্ন পালের জাহাজের মতো উদ্ভ্রান্ত হয়ে সে পড়তে লাগল। বারবার ঝাপসা হয়ে যাওয়া চিঠিটি পড়তে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল, হাত দিয়ে চোখ মুছে পড়তে লাগল সে। শেকড় সন্ধানী মানিক আজ যেন অকাতরে নিজের অনুসন্ধিৎসু মনটাকেই দোষ দিচ্ছিল। সে মিথ্যায় বেঁচে ছিল, তাই বেশ ছিল। চিঠিটি আবার পড়ল, আবার এবং আবার। বারবার পড়েও কোনো পরিবর্তন এলো না অক্ষরগুলোতে।

জ্বলজ্বল করতে লাগল তার চোখের সামনে। চিঠিটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে শুধু বেদনা খুঁড়েছে মানিক, কিন্তু বেদনা খুঁড়ে একটা রত্নও পেয়েছে, মা পেয়েছে। কালো বর্ণের মা নয়, কার্তিকের কখনো না-ফেরা মা নয়, জড় মাটির পাহাড় মাও নয়, আসল মা। যতবার পড়ছে, সেই রত্ন যেন ততই পরিশোধিত হয়ে আরো মহিমান্বিত হয়েছে।

মনে গড়ে ওঠা পাহাড়ি আবেগ যেন ফুঁৎকারেই উবে গেল। স্বার্থপরের মতো সব ভুলে গেল মানিক, কোনো বৃদ্ধার হা-হুতাশ, বাচ্চার কান্না, সহজ-সরল মানুষদের কষ্ট এখন তাকে স্পর্শ করছে না। সিভিল সার্জনের কাছে ছুটির দরখাস্ত লিখে হাশেমের হাতে দিয়ে ছোট একটি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মানিক। দরখাস্ত না লিখলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, এই জঙ্গলে ডাক্তার থাকবে না সেটাই স্বাভাবিক, দরখাস্ত একটা কৌতুকই হবে বটে। বুক পকেটে বারবার হাতিয়ে চিঠির সুরক্ষা নিশ্চিত করছে মানিক। হাশেমকে থানচি পাঠিয়ে সে হাঁটতে লাগল পাহাড়ি রাস্তায়, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারছে না সে, বাস দেখলে উঠে পড়বে কিন্তু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য্য তার নেই এখন।

দূর থেকে কে যেন ডাকছে, 'ডাক্তার বাবু, ও ডাক্তার বাবু'। দৌড়ে কাছে আসল এক পাহাড়ি। তাঁতে তৈরি চেক লুঙ্গি পরা, গায়ে শার্ট এবং অবধারিতভাবে শার্টের বোতাম খোলা, মানিক তাকে আগে কখনো দেখেছে বলে মনে হয় না। কাছে এসে বলল—

আপনারে খুছলাম (খুঁজলাম) বাড়িতে, আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন? যাক ভালো হইল আপনেরে পাইলাম, নাইলে সর্বনাশ হইত।

মানিক না থেমেই বলল, এখন কোথাও যেতে পারব না, আমাকে বান্দরবান পৌঁছাতে হবে।

লোকটা বলল, আমি আপনেরে পৌঁছায় দিব। সামনে রাস্তার মোড়েই আমার ঘর, বাস আইতে আইতে এট্টু দেইখা যান একটা রোগী আছে।

মানিক না করতে পারল না, নিতান্ত অনিচ্ছায় বলল—

ঠিক আছে চলো।

কিছুক্ষণ পরেই তারা রাস্তার মোড়ে চলে এলো, কিন্তু সেখানে কোনো ঘরবাড়ির কিংবা জনবসতির চিহ্নমাত্র নেই। শুধুই পাহাড়, আর রাস্তার পাশে অন্ধকারের মতো

ঘন বৃক্ষ, গুল্মের সারি। পিচঢালা রাস্তাটির পাশে জঙ্গলের দিকেও একটি ছোট প্রায় ম্রিয়মাণ রাস্তা আছে। খুব ভালোভাবে না তাকালে সে রাস্তা নজরে পড়ে না। লোকটি মানিককে জঙ্গলের সেই সরু রাস্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—

বাবু জঙ্গলেই আমার ঘর, দয়া করো বাবু। খুব বেশিক্ষণ লাগব না।

অনুনয়টা মানিক এড়াতে পারল না, কিন্তু সে বান্দরবানের বাসটিও মিস করতে চায় না। সে লোকটিকে বলল—

দুই মিনিট হাঁটব, এর মধ্যে যদি তোমার ঘরে না পৌঁছাই, তবে আমি ফিরে আসব।

লোকটি মাথা নত করে সম্মত হলো। ছোট ছোট লতানো গাছগুলোর দৌরাত্ম্য যেন বেড়ে চলছে। পায়ে জড়িয়ে ধরছে, সূর্যের আলোর ফুসকুড়ির মতো সবুজ বনে কোনোমতে প্রবেশ করেছে। যত ভেতরে ঢুকছে এই ফুসকুড়ির পরিমাণ যেন কমছে সাথে আদিম আঁধার যেন জাঁকিয়ে বসছে। মানিক থামল, লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল—

আর যাব না, ক্ষমা করো। আমাকে ঢাকা যেতে হবে, আমি বাসটা মিস করতে চাই না।

লোকটি কিছু বলল না কিন্তু মুখে যেন একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল—

বাবু যাইতে তো হইবই। চলেন।

লোকটার মধ্যে রহস্যজনকভাবে এরই মধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। লোকটাকে মোটেই সহজ-সরল মনে হচ্ছে না এখন। তার চোখের তারায় কোনো দুরভিসন্ধি চিকচিক করছে। মানিক ঘুরে দাঁড়াল, পেশিগুলো শক্ত করে আছে, দৌড় দিবে মনস্থির করল।

মানিক উল্টো ঘুরে পা চালানো মাত্রই হঠাৎ বড় গর্জন গাছের আড়াল থেকে কিছু একটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাঁজরের কাছে প্রচণ্ড ধাক্কায় শুকনো পাতার বিছানায় ধসে পড়ল সে। কিছুক্ষণ যেন সবকিছু অন্ধকার দেখল। আকস্মিক আক্রমণে মানিক হকচকিয়ে গেল, চিৎকার করতে পারছে না, নড়াচড়াও করতে পারছে না। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই কেউ তার মুখটা কালো কাপড়ে ঢেকে দিল। অচিরেই সে আবিষ্কার করল তার হাত দুটি বাঁধা।

দুই পাশে দু'জন ধরে তাকে দাঁড় করাল। পাহাড়ে বালি জমে অনেক সময় বিশাল শিলা তৈরি হয়, সেগুলো খুব শক্ত থাকে, অনেকে এই শিলাগুলোকে অসুরের হাড় বলে। মানিকের বাহু ধরা দুটি হাত যেন সেই অসুরের হাড়ের মতো শক্ত। ব্যথায় মানিকের মুখটা কুঁচকে গেল কিন্তু কাপড়ে ঢাকা থাকার কারণে অসুররা তা বুঝতে পারল না। আরেকটি নতুন কণ্ঠ শুনতে পেল মানিক।

ডাক্তার বাবু আপনেরে আমরা মারব না, যতক্ষণ আপনি আমাদের কথা শুনবেন।

মানিক নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে বলল—

আপনারা কারা? দেখুন আমাকে ঢাকা যেতে হবে, এক্ষুনি যেতে হবে। নয়তো আপনারা যেখানেই বলতেন আমি যেতাম।

লোকটা গলায় উদাসীনতা ফুটিয়ে বলল—

ঢাকায় যাইবেন, যেইখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইবেন। কিন্তু এখন আমাদের সাথে যাইবেন। কোনো প্রশ্ন না করে শুধু হাঁটবেন। হাঁটতে না পারলে বলবেন, আপনাকে ঘাড়ে করে নিয়া যাব।

মানিক অস্থিরভাবে বলল—

আপনারা বুঝতে পারছেন না, আমাকে যেতেই হবে। প্লিজ। আমি ফিরে আসলে যেখানে বলবেন সেখানে যাব, কথা দিলাম।

সেই লোকটি এবার গম্ভীরভাবে বলল—

আর কোনো কথা না, চলেন।

মানিকের পাশে দুজন হাঁটতে শুরু করল, সে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না, দুজন অসুর তাকে প্রায় টেনে-হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর মানিক নিজেই হাঁটতে শুরু করল, কিন্তু অসুরের দুটি হাত তাকে মুক্তি দিল না। কেউ কোনো কথা বলছে না। শুকনো পাতা পা দিয়ে মাড়িয়ে চলার শব্দ হচ্ছে শুধু। একটু পরে পাতা মাড়ানোর শব্দটা নিস্তেজ হয়ে গেল, পায়ের নিচে এখন সজীব ঘাস অথবা ছোটখাটো বীরুৎ। শ্বাস ধরে এলে সে বুঝতে পারে পাহাড় ভিঙ্গাচ্ছে। মাঝে মাঝে কিছু অজানা ডাক কানে আসে। ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের ডাক বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে, সাথে বশাদের গুনগুনও। সব ছাপিয়ে হঠাৎ কিসের কোলাহলের শব্দ যেন দূর থেকে ভেসে কানে লাগছে। কোলাহলটা একসময় গর্জনে রূপ নেয়। এই গর্জন কোনো মানুষের কিংবা কোনো জন্তুর নয়।

পাহাড়ের গর্জন। মানিক বুঝতে পারে কাছে কোথাও পাহাড় চিরে ঝরনা বইছে। এতক্ষণ পরে মানিকের ডান পাশের অসুরটি কথা বলে ওঠে। কাকে যেন লক্ষ করে বলে,

একটা পনাম কইরা আসি দেবতারে। কত দিন দেখি না। আগে পত্যেক দিন পনাম করতে আসতাম।

দেবতাদের বিচরণ আসলেই সর্বত্র। জনমানবহীন এই স্থানেও তারা আসন পেতেছে। একটু আগে কথা বলা লোকটির গলা আবার শুনতে পেল মানিক। সে সম্ভবত তাদের দলপতি। বলল—

না এখন সময় নাই, খায়াচিং তুই আর ঝামেলা করিছ না।

লোকটি অনুনয় করে বলল—

তোমরা আগাও না মংতোদা, আমি একটা পনাম কইরা চলি আছবো। তোমাগো ধরতে বেশি সময় লাগব না।

লোকটি আর কিছু বলল না, মানিকের একটি বাহু মুক্তি পেল। তারা আবার হাঁটতে শুরু করল। ঝরনার গর্জন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। মানিক বুঝতে পারল তারা চারজন আছে, এদের মধ্যে তিনজনের কথা শুনেছে, আরেকজন যে তার বাম বাহুটি ধরে রেখেছে সে একেবারে চুপ। একটি কথাও বলেনি সে। তিনজনের মধ্যে দুইজনই সম্ভবত বিতাড়িত পাহাড়ি। গহিন বনের পাহাড়িরা কখনো নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলে না।

কয়েকটা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আর বেশ খানিকটা জঙ্গলি পথ হেঁটে মানিক আর চলতে পারছে না, এলিয়ে পড়েছে নিশ্চুপ অসুরটার উপর। ঝরনার শব্দ অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। মশাদের গুনগুন আর ঝিঁঝি পোকাদের চিৎকারের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের শব্দ পাওয়া যায়, কিছু আর্তনাদ, কিছু হুংকার। তাদের গতিও কমে এলো, সম্ভবত খায়াচিং-এর জন্য। প্রথম কথা বলা লোকটি, নিজের উষ্মা জাহির করল, মারমা ভাষায় কথা বলল লোকটি, তাই মানিক কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু এতটুকু বুঝা যাচ্ছে, খায়াচিং-এর দল থেকে আলাদা হওয়া সে পছন্দ করছে না। তারা একসময় থামল, মানিককে বসতে দেয়া হলো। মানিক ক্লান্ত কণ্ঠে বলল—

হাত বাঁধা অবস্থায় হাঁটতে খুব কষ্ট হয়, মুখে কাপড় থাকলে নিঃশ্বাস নেয়া যায় না। আমি তো পালাতে পারব না, পালিয়ে যাবই বা কোথায়। একটু এগুলো খুলে দিন।

দলপতি মংতো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর আবার সেই লোকটির সাথে কথা বলতে লাগল। লোকটির নাম সম্ভবত আংসাই। আংসাই একটু বাক-বিতণ্ডা করে রাজি হলো। মানিকের হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হলো, নিজের হাত দুটিকে ইচ্ছামতো নড়াচড়া করার মতো খুশির যেন আর কিছু নেই। মানিক নিজেই মুখের কালো কাপড়টি সরিয়ে নিল। আগুন জ্বালানো হয়েছে, সেই আগুনের আলোই যেন তার চোখে বজ্রপাত করল। ধীরে ধীরে সয়ে এলো আলোটা। চারপাশে ঘন জঙ্গল। এখানে কিছু জায়গা কেটে বসার জায়গা করেছে তারা। মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে তাতে রান্না হচ্ছে সম্ভবত। মানিকের পেট মোচড় দিয়ে উঠল, ক্ষুধাটা অনুভব করেনি এতক্ষণ। সে অবাক হয়ে লক্ষ করল, যাকে সে অসুর ভেবেছিল সে তো একেবারে লিকলিকে একটা ছেলে। এই লিকলিকে ছেলেটির গায়ে এত শক্তি! শার্ট পরা লোকটি, শার্ট খুলে ফেলেছে, তাকে দেখতে একেবারে কৃষকদের মতো লাগছে। এখানে সবার মধ্যে সে-ই সম্ভবত বয়সে বড়। তাদের সবার মধ্যে মংতো একেবারে পরিপাটি। সে একটা চাদর সুন্দর করে গায়ে জড়িয়ে রেখেছে।

রান্নাটা সে নিজেই করছে। তার চেহারার মধ্যেই একটা গম্ভীর ভাব আছে, বুঝা যায় সে কৃষক শ্রেণির নয়। তাকে দেখেই বলে দেয়া যায়, এই দলের নেতা সে।

সবার মুখে আগুনের আভা পড়েছে, মানিক ছাড়া কারো মুখে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই। মানিক না থাকলে কিংবা খায়াচিং দেবতা দর্শনে না গেলে হয়তো তারা এখানে থামতও না। তাদের সাথে অনেকগুলো বস্তার মতো পুঁটলি, সেগুলো বহন করার পরও

ক্লান্তি তাদের গ্রাস করতে পারেনি। একটা পুঁটলি খুলে সেখান থেকে চাল বের করল মংতো। একটা বাঁশের কঞ্চির উপর ফুটো করে চালগুলো ঢেলে দিল সাথে একটু ডাল, একটা শুটকি একটা লঙ্কা আর পানি দিল। তারপর বাঁশের পাতা গুঁজে মুখটা বন্ধ করে দিল। এরকম পাঁচটা তৈরি করল। আংসাই আগুনটাকে একটু উসকে দিল, আগুনের কয়লায় বাঁশের কঞ্চিগুলো ছেড়ে দেয়া হলো। মংতো কিছুক্ষণ পরপর কঞ্চিগুলো নাড়িয়ে দিচ্ছিল আর চোখ রাখছিল জঙ্গলে। খায়াচিং-এর জন্য চিন্তাটা মনে হয় বাড়ছে তার। মশাদের রাজত্ব এই জঙ্গলে। সারাক্ষণ হাত নেড়েও মশাদের নিবৃত্ত করতে পারছে না মানিক : গাছের পাতা দিয়ে সবাইকে একটা ঝাড়ুর মতো বানিয়ে দিল লিকলিকে অসুরটি। গরুর লেজের মতো সবাই ব্যবহার করছে তা। কিন্তু মশাদের উৎপাত বন্ধ হচ্ছে না। বাঘ-সিংহের চেয়ে ভয়ানক মনে হচ্ছিল মশাগুলোকে। হঠাৎ খসখস শব্দ শুনে সবাই সচকিত হলো, আংসাই পুঁটলি থেকে একটা লম্বা ছোরা বের করে ফেলেছে, নিরাপত্তার জন্য নয় শিকার করার জন্য, তার মুখটা পুলকিত হলো কিন্তু শব্দটা কাছে আসতেই সে ছোরাটা তার পুঁটলিতে ঢুকিয়ে ফেলল। হতাশ হয়ে মংতোর দিকে তাকিয়ে বলল—

খায়াচিং।

মংতো আশ্বস্ত হতে পারল না, সে নিজের ছোরাটা তাক করে ধরে থাকল। একটু পরে আসলেই গাছের আড়ালে মানুষের ছায়া দেখা গেল। খায়াচিং-এর এক হাতে ঘাসের বোঝা অন্য হাতে ঘাসের ডগায় বাঁধা অনেকগুলো মাছ। সে মাছগুলো উঁচিয়ে সবাইকে দেখিয়ে বলল—

দেবতার পসাদ। বিষালি গাছের বিষ দিয়া ধরচি।

এতক্ষণে বুঝা গেল তার দেবতাভক্তির মাহাত্ম্য। বাঁশের কঞ্চি থেকে ফটফট শব্দ বেরুতে শুরু করেছে ততক্ষণে। আগুন থেকে তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা করার পর উপরের দিকটা কেটে গর্জন পাতায় ঢালা হলো। একটি পাতা মানিকের দিকে এগিয়ে দেয়া হলো, দিয়েই পূর্বাভিজ্ঞতায় সবাই একটু দূরে সরে গেল। মানিক চার আঙুলে কয়েকটি ভাত কিংবা খিচুড়ি মুখে পুরে দিল। সাথে সাথেই ভেতর থেকে সব ঠেলে বেরিয়ে এলো। সে জন্যই সবাই একটু দূরে সরে গিয়েছিল। এই খাবার খেয়ে প্রথম বার কোনো বাঙালি বমি করে নাই সে ইতিহাস নেই। মানিক তাকিয়ে দেখল, সবাই একপলক তার দিকে তাকিয়ে হেসে গোগ্রাসে গিলছে এই অখাদ্য। তাদের খাওয়া দেখেই সাহস করে আবার দুটো মুখে দিল। অনেক কষ্টে পেটে চালান করল। তারপর আরো দুটো, খেতে আর কষ্ট হচ্ছে না, বরং ভালো লাগছে। একসময় দেখল সব শেষ। গাটা এলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু মশাদের জন্য বসে থাকাও দায়। খায়াচিং তার হাতের ঘাসগুলো চিপে রস বের করে নিল। নারকেলের বাটিতে ঢেলে এগিয়ে দিল মানিকের দিকে।

নেন ডাক্তার বাবু, গায়ে মাইখা নেন। মশা কিচ্ছু করতে পারব না।

সবাইকে অনুকরণ করে মানিক সবুজ রসটা হাতে, পায়ে, মুখে মেখে নিল, গন্ধটাও বেশ সুন্দর, বাতাবী লেবুর গন্ধ। আসলেই মশারা আর কিছু করতে পারেনি। নীল প্লাস্টিকের একটা ঝিল্লি বের করল লিকলিকে ছেলেটি, সেটা বিছিয়ে দিল আগুনের কাছে।

মানিককে ইশারায় শুয়ে পড়তে বলল। মানিক জিজ্ঞাসা করল,

তোমার নাম কী?

ছেলেটা নিজের জন্য বিছানা তৈরি করছে, মানিকের প্রশ্ন যেন শুনতেই পায়নি। এই অগ্রাহ্যে মানিক মনে একটু ব্যথা পেল। আংসাই জেগে রইল পাহারা দেয়ার জন্য। পালা করে পাহারা দিবে তিনজন।

কাঠের আগুন একটু দমে আসতেই যেন আদিম আঁধার আরো জেঁকে বসল। মানিকের কাছে পুরোটাই স্বপ্নের মতো লাগছে, দুঃস্বপ্ন কি না তা বুঝতে পারছে না। অমাবস্যার ঘন কালো অন্ধকার গাছের ডগাতে কালি মেখে দিয়েছে, আকাশটা দেখা যাচ্ছে না, পাতার আড়ালে দুই-একটা তারা মাঝে মাঝে জ্বলজ্বল করে উঠছে। আগুনটা আরো একটু ঝিমিয়ে পড়ামাত্রই যেন আকাশের সব তারা পাতা ভেদ করে নেমে এলো, পাতায় পাতায় নাচছে, জ্বলছে-নিভছে। কয়েকটি তারা ভেসে মানিকের মাথার উপর চলে এলো, কাছে আসতেই সে বুঝল, সবগুলো জোনাকি পোকা। অমাবস্যা রাতেও জোছনার হাট বসিয়েছে। এই হাটে মানিকের থাকার কথা ছিল না, অন্তত আজ নয়, আগামীকালও নয়। হয়তো অন্য কোনোদিন সে এই হাটের খদ্দের হতে পারত। মুঠো ভরে জোছনা ওড়াত।

বুক পকেটে হাত দিয়ে চোখ মুদল সে।

ভোরবেলায় খায়াচিং-এর ডাকে ঘুম ভাঙল মানিকের। কিন্তু ঘুম ভেঙেই বুঝতে পারল সারা গায়ে ব্যথা। সূর্যের আলো সবে বন রাঙাতে আরম্ভ করেছে। রাতে বনটা যত ঘন মনে হচ্ছিল এখন তত ঘন মনে হচ্ছে না। আগুন জ্বালানো হয়েছে আবার কিন্তু এখন সেই লাল আভাটা নেই, শুধু ধোঁয়া দেখা যায়। আগুনের উপর পাতলা পাথরের চাঙার রেখে তাতে মাছ সিদ্ধ করা হচ্ছে লবণ দিয়ে। আংসাই বন থেকে পাহাড়ি পেঁপে নিয়ে আসল। মানিক খায়াচিং-এর দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে বলল—

আমাকে যেতে হবে।

বাবু আপনে কাইল থেকে এই কথাই কচ্ছেন। আপনার জানের ভয় কইরেন না, আমাদের হুকুম হইল, আপনারে যাতে সমাদর কইরা নিয়া যাই, আবার আপনেরে আমরা কাল্কে কইরা দিয়া যাব।

না না, সেই যাওয়া নয়। সকালে সবাই যে যায়।

ও আচ্ছা। বাইরে যাবেন?

মানিক মনে মনে বলল—

এখন কোন ভেতরে আছি, তবুও সে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়। খায়াচিং মানিকের হাতে তিনটি কচি পাতা ধরিয়ে দেয়। লিকলিকে ছেলেটিকে ইশারায়

মানিকের সাথে যেতে বলে। কিছু দূর হাঁটার পর একটা অশ্বত্থ গাছের নিচে বেশ বড় ঝোপ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ছেলেটা। মানিক ছেলেটিকে বলে—

তুমি একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াও। ছেলেটি নির্বিকার। সে দৃষ্টিসীমার বাইরে যেতে চায় না। মানিক একটু ক্ষুব্ধ হয়েই ছেলেটিকে বলল—

তুমি যদি দেখবেই তাহলে এত দূর হেঁটে ঝোপের আড়ালে আসার কী দরকার ছিল?

ছেলেটি মনে হয় রাগটা একটু বুঝতে পারল, পেছনে সরে দাঁড়াল। মানিকের খুব অস্বস্তি লাগছে কিন্তু কিছু করার নেই, যথা স্থান যথাচার। একটু পরেই ছেলেটি হঠাৎ তিন হাত উপরে লাফিয়ে উঠে 'ভেউ অ ও' ইত্যাদি শব্দ করতে করতে এগিয়ে এলো। মানিক ছেলেটির এরকম অসভ্য আচরণে বিরক্ত এবং বিচলিত হলো, কৃত্রিমভাবে গলা খাঁকারি দিয়ে সতর্কও করল। কিন্তু ছেলেটি থামছে না, গলা খাঁকারির অর্থও বুঝল না, দুর্বার গতিতে মানিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায় মানিক স্তব্ধ হয়ে রইল। ছেলেটি আঙুল দিয়ে মাথার উপর দেখাল, একটি বিশাল চন্দ্রবোড়া পেঁচিয়ে আছে ডালে। মুখটা নামিয়ে এনেছিল, আরেকটু হলেই হয়তো মানিকের মাথাটা পেঁচিয়ে ধরতে পারত। চেঁচামেচি শুনে সবাই দৌড়ে এলো। মানিক সাপটা দেখে একটু ভয় পেল বটে কিন্তু ছেলেটির আচরণে বিরক্তি কমল না। সে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল—

সাপ দেখে মুখে বলতে পারলে না, এ রকম অদ্ভুত শব্দ করছিলে কেন?

আংসাই মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল—

বাবু পারলে কি সে না বলত, কিন্তু সে তো কতা কইতে পারে না, বোবা কালা।

মানিকের মনটা অনুশোচনায় ভরে উঠল। ছেলেটির নাম কাজাচাই। বাপ-মা নেই। বড় অনাদরে বড় হয়েছে। বোবা বলেই কারো কাছে আদরের আবদারও করতে পারেনি। ফুট-ফরমায়েশ খেটে খাবার জোগাড় করে। এক বেলা খাবারের জন্য সারাদিন পাহাড়ে কাজ করে। মংতোর মায়া হয় কাজাচাই-এর জন্য। তাই সে তার সাথে কাজে নিয়েছে। সে কৃতজ্ঞতায় কাজাচাই এখনো নুয়ে থাকে। মংতোর বোঝা ইচ্ছে করে নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়, সব কাজে এসে হাত লাগায়, তবুও তার কৃতজ্ঞতা শেষ হয় না।

মানিক খাওয়ার সময় তার মাছ থেকে অর্ধেকটা কাজাচাই-এর পাতায় তুলে দেয়। হাত দিয়ে নিজের পেটের দিকে ইঙ্গিত করে দেখায় যে পেট ভরে গেছে। কাজাচাই মাথা নুয়ে থাকে, মুখের ভাষা বুঝতে না পারলেও সে চোখের ভাষা বুঝে। পেট ভরে গেছে বলে এই মাছ তার ভাগ্যে জুটেনি, এই বাঙালি বাবুটির চোখে কৃতজ্ঞতা আর মায়া ফুটে উঠেছে, মাছের অর্ধাংশ সেই মায়া আর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। কাজাচাই লজ্জা পায়, সে কৃতজ্ঞ হতে জানে, কৃতজ্ঞতা পেতে জানে না। একটু মায়াতেই তার মন ভরে যায়। এই বাঙালির মায়ায় তার মন ভরে গেছে। রাজ্যের খাবারে কিংবা দামি রত্নে সে বিকায় না, কিন্তু একটু মায়ায় সে বশ হয়ে যায়। মানিকের প্রতি তার শ্রদ্ধা-ভালোবাসা

বহুগুণে বেড়ে গেল। এই বাঙালি ডাক্তার বাবুর জন্য সে অজগরের মুখে মাথা পেতে দিতেও রাজি এখন।

পাহাড়ের নিজস্ব ভাষা আছে, নিঃশব্দে ডাকতে পারে। সবাই সে ডাক শুনতে পায় না। মানিক পায়। বহু কষ্টে খায়াচিং আর কাজাচাই-এর ঘাড়ে চড়ে যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠছে তখন ভাবে আর এক পাও ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু চূড়ায় উঠেই যখন দেখে দূরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে অনেকগুলো পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, সে যেন তাদের ডাক শুনতে পায়। আবার পেছন থেকেও শুনতে পায়, তার মা যেন ডাকছে তাকে। কোনোটাই অগ্রাহ্য করতে পারে না সে।

মানিকের পায়ে বেশ কিছু ফোস্কা পড়েছে, হাঁটতে গেলেই পা থেকে তীব্র একটা ব্যথা ঢেউয়ের মতো সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। কাজাচাই-এর ঘাড়ে হাত রেখে বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে বসে পড়ল মানিক। মংতো কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ঘন গাছের জন্য সূর্যের আলো ঠিকমতো পৌঁছায় না বনের নিচের দিকে। পানি ভর্তি চামড়ার থলেটি মানিকের দিকে এগিয়ে দিল খায়াচিং। মানিক ঢকঢক করে অনেকটুকু পানি খেয়ে নিল। এক নিঃশ্বাসে খেয়েছে, এখন শ্বাস নেয়ার জন্য হাঁপাচ্ছে। খায়াচিং বন থেকে কিসের পাতা যেন বেটে এনে মানিকের পায়ে লাগিয়ে দিল, একটু ভালো লাগছে। খায়াচিং-এর ভেষজ জ্ঞান দেখে মানিক তাকে জিজ্ঞাসা করল—

কোথা থেকে শিখলে?

আমরা পাহাড়ে থাকি, আমাগো ছানতেই (জানতেই) হয়। জঙ্গল আমাগো সব দেয়, খালি বুঝে নিতে হয়। আর ছম্মান করতে হয়। আমার বা (বাবা) বলত, একটা পাতা ছিঁড়লেও যাতে গাছের কাছে কমা (ক্ষমা) চাই। আমার বাবার মতো বৈদ্য পাহাড়ে আর নাই।

তোমার বাবা কোথায়?

খায়াচিং একটু উদাস হয়ে গেল বলল—

বারে মুইরে দেখি না অনেক দিন, খাগরাছড়িতে আমাগো বাড়ি আছে। কত দিন বাড়িতে যাই না।

সব ছেড়ে এখানে এসে পড়ে আছ কেন?

খায়াচিং কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আংসাই তখনি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে ইশারা করল। তিনকোনা বাঁশ আর জাল দিয়ে তৈরি একটা ফাঁদ হাতে সে এগিয়ে চলছে ঝোপের দিকে। ঝোপের কাছে গিয়ে সন্তর্পনে ফাঁদটি নিচে নামাতে থাকল।

একসময় বিদ্যুৎ গতিতে মাটিতে চেপে ধরল। ভেতরে কিছু একটা ছটফট করে বেরিয়ে যেতে চাইছে। আংসাই জালের ভেতর হাত দিয়ে একটা বড়সড় খরগোশ বের করে আনল। তার মুখে বিস্তৃত হাসি। দুই হাতে মাথাটা মুচড়ে ঘাড়টা ভেঙে দিল। খরগোশটা নড়াচড়ার সুযোগও পেল না।

আগুন জ্বালিয়ে সেখানেই রান্না শুরু হলো। খরগোশের ভর্তা বানানো হয়েছে, মানিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে খানিকটা মুখে দিয়েছে, অপূর্ব স্বাদ। গোগ্রাসেই গিলল। খেতে খেতেই আংসাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল—

তুমি তো বেশ ভালো শিকারি, কী কী শিকার করেছ?

আংসাই মুখে এক লোকমা খাবার পুরে দিয়ে খেতে খেতে বলল—

অনেক জানোয়ার মারছি—পাখি, খরগোশ, বন শুয়োর, বাগডাশ, ভল্লুক আর বাঙালি।

অদ্ভুত হিংস্রতা ফুটে উঠল আংসাইয়ের চোখে। মানিক করুণা নিয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে।

আবার হাঁটা শুরু হলো, হাঁটা না বলে আরোহণ আর অবরোহণ বলাই ভালো। ছোট ছোট টিলা পেরিয়ে যাচ্ছে তারা, এখন পর্যন্ত কোনো জনমানব চোখে পড়েনি। মানিকের মনে এখন কোনো বিদ্রোহ নেই, কোনো অনুভূতি নেই, পায়েও নেই। জুতা খুলে ফেলেছে অনেক আগেই, ক্ষতগুলো ধারালো ঘাসের আঘাতে আরো গভীর হয়েছে, কিন্তু এখন আর ব্যথা করছে না। হয়তো খায়াচিং-এর সেই পাতা কাজ করেছে। ছোট একটি টিলার উপর উঠে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখল সে, নিচে ঘন বনে বড় বড় গাছগুলো মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করছে, লুটিয়ে পড়েছে একটা আরেকটার উপর। আংসাই সবাইকে হাতের ইশারায় বসতে নির্দেশ দিল। মানিক মংতোকে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল—

কী হচ্ছে এখানে?

মংতো দাঁত চিবিয়ে উত্তর দিল—

বনের ডাকাইত, কাঠ চুরি কইরছে।

বন কর্মকর্তারা জানে না?

জানব না কেন, তারাই তো চুরি কইরছে। জানোয়ারের দল।

কিন্তু এখান থেকে শহরে এই কাঠ কীভাবে নিয়ে যাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর মংতো দিল না, দিল খায়াচিং। বলল—

সাঙ্গু নদী বেশি দূরে না, নদীতে ভাসাই নিয়া যাইব।

মংতো খায়াচিং-এর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকল, কিন্তু এই পাকানো চোখের মর্মার্থ খায়াচিং বুঝতে পারল না। সে বিগলিত হাসি দিয়ে মংতোর দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টির অর্থ হলো, দেখেছ আমি সব চিনি। খায়াচিং-এর ভৌগোলিক জ্ঞানে মংতো খুশি হতে পারেনি, তাদের অবস্থান সে ডাক্তার বাবুকে জানাতে চায়নি, তাকে অনেক সাবধান থাকতে হয়।

টিলা থেকে নেমে ঘুর পথে তারা আবার চলতে শুরু করল। একটা বড় খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে উঠল কিন্তু নামার উপায় নেই। পাহাড়টা চূড়া থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট গভীর পর্যন্ত ধসে গিয়েছে। কাছে গিয়ে দেখল একটা লম্বা শিমুল গাছে খাঁজ কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। সেটা বেয়ে আংসাই অবলীলায় নেমে গেল। খায়াচিং-এর পেছনে মানিকও নেমে গেল, নিজেকে তাদের থেকে আলাদা কেউ মনে হচ্ছে না তার।

রাতে একটি খোলা জায়গা দেখে ক্যাম্প করা হলো। আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে শুটি পাকিয়ে শুয়ে আছে সবাই। খায়াচিং জেগে আছে পাহারায়। একা একা চুপচাপ বসে থাকতে তার ভালো লাগে না। মানিকের চোখেও ঘুম নেই, সে চিত হয়ে শুয়ে তারা দেখছে। মাঝে মাঝে শীতল বাতাস শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরপর বনে একটা তক্ষক ডেকে ওঠে, বাতাসটা সে ডাকের কিছুক্ষণ পরেই এসে গা ছুঁয়ে যায়, তক্ষকটা যেন সেই বাতাসের পূর্বাভাস দেয়। মানিক খায়াচিং-এর অস্বস্তি কিছুটা ঘুচাল, বলল—

আর কত দূর যেতে হবে?

আর তো অল্প এট্টু, ঝিড়ি ধইরে হাঁটলে এক দিন, দেড় দিন লাগব।

এক দিন-দেড় দিন হাঁটা অল্প একটু? মানিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—

তুমি ঘরবাড়ি ছেড়ে এত দূরে এই গহিন পাহাড়ে কেন এলে?

পিরিতের লাইগা বাবু।

মানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। শীতল বাতাসের পরশে, আগুনের আঁচে, তারাভরা আকাশের নিচে এক পাহাড়ি যুবকের গল্প শুনছে মানিক।

মহালছড়িতে দেবতার পুকুর পাড়ে বসে স্বপ্ন দেখতে দেখতেই দিন কেটে যেত খায়াচিং-এর। একদিন দেবতার সামনে পাথরের বেদিতে বসে উথাই-এর গলায় মালা দিবে সে। উথাইকে ছোট ডিঙ্গিতে বসিয়ে সাঙ্গু পাড়ি দেবে সে। একসাথে বসে সূর্যাস্ত দেখবে। রাতে কুপির আলোতে উথাই-এর মুখটা দেখবে, তারপর মুখে দুষ্টু হাসি ফুটিয়ে ফুঁ দিয়ে বন্ধ করে দিবে কুপিটি। স্বপ্ন দেখতে দেখতেই ঘাসের উপর ঘুমিয়ে পড়ে খায়াচিং, ঘুমন্ত মুখেও প্রশান্তি লেগে থাকে। একদিন তার ঘুম ভেঙে যায় উথাই-এর হাসির শব্দে। উথাই হাসতে হাসতে পাথরের বেদিতে এক বাঙালি ছেলের উপর ঢলে পড়েছে। তাদের দুজনের গলায়ই মালা। উথাই সে মালা পরে ছেলেটির হাত ধরে চলে গিয়েছিল।

মারমা পাড়ায় ছিঃ ছিঃ পড়ে গেল। উথাইয়ের বাড়িতে মাতম। তার বাবা সমাজের সবাইকে ডেকে মেয়েকে মৃত ঘোষণা করল, ঘরে মেয়েরা বিলাপ করল। ঘি, কাঠ, ঢোল, বাদ্য দিয়ে উথাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হলো। চিতা জ্বালানো হলো, দেবতাকে ভোগ দেয়া হলো সাথে সমাজের সবাইকেও। খায়াচিং কিছুতেই যোগ দিল না। সে বসে রইল দেবতার পুকুর পাড়ে। দেবতার পায়ে ফুল দিয়ে সে উথাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করল। প্রতিদিন সে দেবতার কাছে প্রার্থনা করত, তার উথাই যেন ভালো থাকে। কিন্তু দেবতা খায়াচিং-এর প্রার্থনা শুনেনি।

দুই মাস ঘর করে একদিন বাঙালি ছেলেটি উথাইকে ফেলে চলে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। কাঁদতে কাঁদতে উথাই ফিরে এলো মারমা পাড়ায়। কিন্তু মৃত মানুষের স্থান নেই তাদের সমাজে। সবাই ফিরিয়ে দিয়েছিল তাকে কিন্তু খায়াচিং পারেনি। উথাইকে নিয়ে সমাজ ছেড়েছে সে, আশ্রয় নিয়েছে গহিন পাহাড়ে।

আগুনটা প্রায় নিভে গেছে, রাত প্রায় দ্বিপ্রহর। খায়াচিং-এর পাহারার পালা শেষ। এবার সে ঘুমাতে পারবে। আংসাই জেগে উঠেছে। আবার আগুনটাকে উসকে দিয়েছে সে। মানিক বুক পকেটে হাত দিল আবার। তার ঘুম আসছে না।

মন বিদ্রোহ না করলেও শরীর ঠিকই বিদ্রোহ করে বসল মানিকের। হালকা জীবন-যাপন করা মানুষ দুই দিন পাহাড়ে হাঁটলে যা হয় আর কি। শরীরে তীব্র ব্যথার সাথে যোগ হয়েছে জ্বর, চোখে যেন জবা ফুল ফুটেছে। মানিক একটা ঘোরের মধ্যে আছে, ঘোরের মধ্যে থেকেও মংতোর চিন্তিত মুখটা দেখতে পেল সে। কাজাচাই একটু পরপর এসে মানিকের কপালে হাত রাখছে, আর হাত উঁচু করে জ্বরের তীব্রতা বুঝাচ্ছে। খায়াচিং কী একটা বিদঘুটে গন্ধের পাতার রস খাইয়ে দিল, তাতে জ্বরের বিশেষ ক্ষতি হলো না, শুধু মানিক বার দুয়েক বমি করল। তার মধ্যেই কোথা থেকে মেঘগুলো সব মুখ কালো করে চোখ পাকিয়ে তাদের মাথার উপর দম মেরে বসে পড়ল। মংতোর চেহারায় অসহায়ত্ব ফুটে উঠল, তার গম্ভীর ভাবটা আর নেই। মংতোর আশঙ্কা সত্যি হলো, ঝমঝম করে বৃষ্টি এলো পাহাড়ে। মানিককে একটা বাবলা গাছের নিচে বসিয়ে এলোমেলো হাঁটছে মংতো। আংসাই-এর কোনো বিকার নেই, সে বৃষ্টির পানি চামড়ার থলেতে জমাচ্ছে। কাজাচাই মানিকের পাশে বসে আছে, খায়াচিং আর কোন পাতার রস খাওয়ানো যায় তাই চিন্তা করছে। বাবলা গাছে পাতা, কাঁটা ভেদ করে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি অনিয়মিতভাবে মানিকের ঘাড়-মাথা ভিজিয়ে দিচ্ছে। এভাবে ছন্দহীন বৃষ্টির ফোঁটা ভালো লাগে না, সুরহীন বালিকার কর্কশ সা রে গা মা-র মতো মনে হয়। মানিকের ইচ্ছা করছে সরাসরি বৃষ্টিতে ভিজতে।

পাহাড়ে ইচ্ছা অপূর্ণ রাখতে নেই, মানিক অবশিষ্ট বল দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তার হাঁটু দুটি কাঁপছে, দেহের ভার সইতে তাদের বেজায় কষ্ট হচ্ছে। মানিক দুই হাত ছড়িয়ে খোলা জায়গায় বৃষ্টি আলিঙ্গন করল। কাজাচাই এসে তার পাশে ভিজতে থাকল। মংতো সব চিন্তা বাদ দিয়ে এই শিশুতোষ আচরণ উপভোগ করছিল। মানিকের গায়ে যেন বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সেতার বাজাচ্ছিল, চোখ খুলে দু' চোখে বৃষ্টি ভরে নিল। তারপর লুটিয়ে পড়ল ঘাসে।

দড়ি দিয়ে পাকানো দোলনায় শোয়ানো হয়েছে মানিককে। বাঁশ দিয়ে দু'পাশে চারজন মিলে বয়ে চলছে তাকে। মানিক জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে—

মা, মাগো। আমার মাথায় হাত রাখো মা, উনত্রিশ একে উনত্রিশ, উনত্রিশ দুগুণে আটান্ন, চন্দন বাবু আমি সব নামতা পারি, আমার মা কই? চন্দন বাবু। কার্তিক কার্তিক তোর তাজেল্লকে বাঁচা, তোর মার মতো হারিয়ে যাবে তাজেল। মা, মা।

পানির উপর পায়ের ছপাত ছপাত শব্দে মানিকের মোহভঙ্গ হলো, চোখ খুলে দেখল পৃথিবী দুলছে, আসলে সে নিজে দুলছে। দুই পাশে পাথুরে পাহাড়, নিচে পানির শব্দ, এটাই বুঝি পাহাড়ি ঝিরি। মানিক আবার চোখ বন্ধ করল, একসময় ঘুমিয়ে পড়ল অথবা মূর্ছা গেল। হাতটা বুক পকেটে স্থির ছিল।

মাথায় মমতাময়ী একটা হাত স্পর্শ করেছে, কাজাচাইয়ের শক্ত কাঠের মতো আঙুল নয়। মায়ের মমতাময়ী আঙুল। মানিক প্রশান্তি নিয়ে চোখ খুলল, চোখ খুলেই আবার বন্ধ করে ফেলল। সে নির্ঘাত ভুল দেখছে। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে একই দৃশ্য দেখে বিচলিত না হয়ে পারল না। চোখ দুটোকে একটু কচলে নিল, তাতে দৃশ্যের হেরফের হলো না। তার বিছানার পাশে ক্রাসিমা বসে আছে, সেদিনের মতো নয়। চুলগুলো পরিপাটি করে বাঁধা, মাথায় সাদা চালতা ফুলের পাপড়ি লাগিয়েছে, গায়ের পোশাকে কোনো ময়লা নেই—

চোখে সে ঘৃণা নেই। মানিক ক্রাসিমার দিকে তাকিয়ে বলল—

আমি কি মারা গেছি?

আর একটু হলেই মরতেন।

মানিক একটু হেসে বলল—

এই কথা একসময় আমি তোমাকে বলেছি, আজ আমরা জায়গা বদল করলাম, শোধবোধ হয়ে গেল।

না শোধবোধ হয়নি, আমি সেদিন সব হারিয়েছিলাম, বাবা হারিয়েছিলাম।

আমিও সব হারিয়েছি, মা হারিয়েছি। আশা করি এবার শোধবোধ হয়েছে।

ক্রাসিমা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল—

শোধবোধ হিসাব করলে, আমি আপনার কাছে জীবনের তরে ঋণী। তবুও পাহাড়ি হিসেবে কিছু দাবি করতেই পারি, বাঙালিরা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে, এবার আমরা একজন বাঙালির কাছেই উপকার চাইছি। তাহলে শোধবোধ হবে।

মানিক অবাক হয়ে বলল—

আমি কী করতে পারি?

ক্রাসিমা বলল—

আপনার যা কাজ তাই করতে হবে, দিন পনেরো আগে বিডিআর-এর সাথে গোলাগুলিতে আমাদের নেতার পায়ে গুলি লেগেছিল, সেখানে ক্ষত হয়ে গেছে, আমাদের বৈদ্যরা সারাতে পারছে না, হাসপাতালে নেয়াও সম্ভব নয়। তাই আপনাকে আনা হয়েছে, সেটাকে যদি আপনি অপহরণ বলেন, তবে তাই।

আর আমার মুক্তিপণ কী? তোমাদের নেতার সুস্থতা? উনি সুস্থ না হলে আমাকে কি মরতে হবে?

আপনাকে মরতে হবে না, আপনাকে শুধু চেষ্টা করতে হবে। আসলে আপনাকে আমরা জোর করছি না, শুধু সাহায্য চাইছি। এখানে এই পাহাড়ের আশেপাশে প্রায় পনেরোটা গ্রাম আছে, তাদের অধিকাংশই প্রিয়জন হারিয়ে ভিটা-মাটি ছেড়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। নেতার কিছু হলে এরা আবার দিশাহীন হবে।

ডাক্তার হিসেবে আমি আমার কাজ করব, সে জন্য আমাকে অনুরোধ করতে হবে না। কিন্তু তুমি এখানে কীভাবে?

আমার পাহাড়ি ভাইরা আমাকে উদ্ধার করে এনেছে।

উদ্ধার করে এনেছে মানে? তোমাকে কি আমি বন্দি করে রেখেছিলাম?

ক্রাসিমা একটু লজ্জা পেল, বলল—

না না সে নয়। আর শুনুন আপনিও এখানে বন্দি নন। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ান, চাইলে চলে যেতে পারেন যদি পথ চিনে যেতে পারেন।

শেষের খোঁচাটা হজম করে নিল মানিক। বলল—

প্রয়োজনবোধে যেতেও পারি।

ক্রাসিমা বলল—

আপনাকে খোঁজার জন্য নিশ্চয়ই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে।

মানিক একটু উদাস হয়ে বলল—

না, আমাকে খোঁজার জন্য কেউ আসবে না। ছুটির দরখাস্ত করে এসেছি, আর আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করেও নেই।

ক্রাসিমা একটু আহত হলো, যদিও এটা সুংবাদই বটে, তবে মানিকের বেদনাটা যেন অনুভব করল সে। অপরাধীর ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল,

আপনার মায়ের কথা কী বলছিলেন? মংতোদা তো বললেন, আপনি অ... মানে আপনার বাবা-মা নেই।

মানিক চাদরের তলায় বুকে হাত দিল, তার গায়ের জামাটি নেই। তার পুরো পৃথিবী যেন ফাঁকা হয়ে উঠল, সে ধরফর করে বিছানা থেকে উঠল, চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে বলল—

আমার জামা কই?

ক্রাসিমা একটু অবাক হলো, বারান্দায় ঝুলানো শার্টটি এনে দিয়ে বলল—

ভিজে গিয়েছিল, শুকাতে দিয়েছিলাম।

মানিক শার্টটি হাতে নিয়েই আগে পকেটে হাত ঢুকাল, তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কাগজটা একটু দুমড়ে গেছে, বৃষ্টিতে ভিজে ঢেউ হয়েছে কাগজে কিন্তু ছিঁড়ে যায়নি। ক্রাসিমা কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

এটা কী? চিঠি?

মানিক শার্টটি গায়ে দিয়ে বলল—

কিছু না।

উপেক্ষাটা ক্রাসিমার নজর এড়ায় না। তাকে কেউ উপেক্ষা করে না, এই অভিজ্ঞতা তার নতুন। মনে মনে একটু ক্ষুব্ধও হলো নিজের উপর। মানিকের এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে। এই ঘরটি অন্যান্য পাহাড়ি ঘরের মতোই তবে এখানে পুরোটাই বাঁশ আর ছন দিয়ে তৈরি, কোনো কাঠ নেই। সে যে খাটে শুয়ে আছে সেটাও বাঁশের তৈরি। ঘরে তেমন আসবাব নেই, কোনো জানালাও নেই। মানিক ক্রাসিমাকে জিজ্ঞাসা করল—

এই ঘরে জানালা নেই কেন?

ক্রাসিমা বলল—

তা জানি না, তবে এখানে কেউ থাকে না। শুনেছি কাউকে ধরে আনলে এখানেই রাখা হয়, না মারা পর্যন্ত।

মানিক সরু চোখে তাকাল। ক্রাসিমা সে দৃষ্টি এড়িয়ে বলল—

আপনার যদি সমস্যা না হয় তবে কি একটু আপনার রোগীকে দেখে আসবেন?

মানিক বলল—

হুম তাই ভালো। চলুন।

বাহিরে আসতেই সকালের স্নিগ্ধ আলো চোখে লাগল, বাঁশ দিয়ে খোলা বারান্দা বানানো হয়েছে, একপাশে বাঁশের সিঁড়ি লাগানো আছে। নিচে বিশ-পঁচিশ জন পুরুষ-মহিলা আর কিছু বাচ্চা উদাস মুখে বসে আছে। তারা এক দৃষ্টিতে মানিকের দিকে তাকিয়ে আছে—

তাদের চোখে হতাশা ঝরে পড়ছে। মানিক ক্রাসিমার দিকে তাকিয়ে বলল—

এরা কারা? এখানে জড়ো হয়েছে কেন?

আপনি আছেন জেনে এসেছে এরা, আশেপাশের গ্রাম থেকে এসেছে।

এদের মন খারাপ কেন? আমি অসুস্থ ছিলাম বলে?

না, এরা ভেবেছিল আপনাকে মারা হবে। কোনো বাঙালিকে মারা হলে এখানে উৎসব হয়, পাঁঠা বলি দেয়া হয়। মেয়েরা সাজে, গান গায়। পুরুষেরা 'রা' খায়। ঢোল বাজে, মাদল বাজে। দেবতাকে পুজো দিয়ে ধন্যবাদ জানায়, আরো একজন পাহাড়ের শত্রু ধ্বংস হলো। এরা যখন জানল, আপনাকে মারা হবে না, তখন সবাই একটু হতাশ হয়ে গেছে।

মানিক নিরীহ অতৃপ্ত চেহারাগুলোতে আবার চোখ বুলাল। তাকে জীবিত দেখে আর কারো মুখে এমন হতাশা দেখেনি সে। বাচ্চাদের করুণ মুখ দেখে বেঁচে থাকার জন্য রীতিমতো অপরাধবোধ হচ্ছে তার। সে এই নারী-পুরুষ বাচ্চাদের মজলিশ পেরুনোর সময় অনেকগুলো দীর্ঘশ্বাস পাড়ি দিয়ে গেল। মানিক মনে মনে পাঁঠাটার কথা ভেবে স্বস্তিবোধ করল, অন্তত তার বেঁচে থাকায় পাঁঠাটা খুশি হবে।

গ্রামটি বলিপাড়ার মারমা পাড়ার তুলনায় অনেক ছোট, ঘরগুলোও যেন একটু ছোট। তবে সবুজের কোনো কমতি নেই এখানে। এক গুচ্ছ বাড়ির চারপাশে বড় বড়

টিলা। এই টিলাগুলো যেন গ্রামটাকে আগলে রেখেছে। প্রতিটা বাড়িই কোনো না কোনো গাছের সাথে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন বৃদ্ধা বারান্দায় বসে কোলে তাঁত নিয়ে কাপড় বুনছে। কিন্তু তাদের নিজেদের কাপড় ব্যবহারে চরম অনীহা, অধিকাংশের উর্ধাঙ্গ খালি। তাতে তারা কিংবা অন্য কেউ বিন্দুমাত্র বিচলিত না। লোহার দা দিয়ে বাঁশ চাঁছছে কেউ কেউ। এই বাঁশ দিয়ে কী বানাবে কে জানে, তারা বাঁশ দিয়ে প্রায় সবই বানাতে পারে। গ্রামের একপাশে বুদ্ধের মন্দির, সেখানে একটা মাটির বুদ্ধ মূর্তিও আছে। মন্দিরে শুধু বুদ্ধ বাস করে, বাকি সব দেবতারা নদীতে, জঙ্গলে কিংবা ঝরনায় বাস করে।

আদিবাসীদের সর্দার হিসেবে থুইনুপ্রু খুবই আধুনিক। তার নামের মতোই সে দুর্ভেদ্য এবং জটিল। তার ঘরে ঢুকেই মানিক প্রথমে দেখল রবীন্দ্রনাথের একটি তৈলচিত্র। পাঠার শুকনো মাথা ঝুলানো থাকবে আশা করেছিল সে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ দেখে একটু ভিরমি খেল। ঘরটা বেশ পরিপাটি, এলোমেলো কাপড়-চোপড় নেই, শুধুমাত্র কাপড়-চোপড় দেখেই বলে দেয়া যায় মানুষটা গুছানো। মাথায় পাখির পালক নেই, কপালে শুয়ে আছে একটি ওয়াটার ব্যাগ। চোখ বুজে আছে থুইনুপ্রু। চোখ মেলে তাকাল মানিকের দিকে। ছোট চাপা চোখের পুরোটা দেখা যায় না, তবে একটা ফ্যাকাসে চোখ দেখেই বুঝা যায়, ঐ চোখটি তার কর্মক্ষম চোখ নয়। মুখে একটু হাসি লাগিয়ে বলল—

হ্যালো ডাক্তার। আমি স্যরি, আপনাকে এভাবে কষ্ট দেয়া হলো। কিন্তু আমি নিরুপায়।

মানিক কিছু বলল না, তার মনে ক্ষোভটা রয়ে গেছে। সে থুইনুপ্রুর কপালে হাত দিল, বেশ জ্বর আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। তারপর চাদরটা সরিয়ে ডান পা-টা দেখল, সবুজ পাতায় মোড়া পা-টা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ফোলা দেখাচ্ছে। মানিক পাতাগুলো ধীরে ধীরে সরাতে থাকল, থুইনুপ্রু দাঁতে দাঁত চাপল, ক্রাসিমা মুখ ফিরিয়ে ফেলেছে, সে এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না। পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটুতে ক্ষতটা ছড়িয়ে পড়েছে। মানিক কিছুক্ষণ দেখে আবার ঢেকে দিল। থুইনুপ্রু বলল—

পা-টা কি কেটে ফেলে দিতে হবে?

মনে হচ্ছে কাটতে হবে না, তবে দেরি করলে গ্যাংগ্রিণ হয়ে যাবে, তখন কাটা ছাড়া উপায় থাকবে না। আমার কিছু ওষুধ দরকার।

কী কী লাগবে আপনি লিখে দেন, আমি আনিয়ে দিব।

এভাবে আনতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে, যেতে-আসতে ছয় দিন লাগবে। তত দিনে কী হয় বলা যায় না।

আপনি চিন্তা করবেন না দুই দিনের মধ্যেই আপনার দরকারি সবকিছু পেয়ে যাবেন।

সেটা কী করে সম্ভব?

আপনি সে চিন্তা করবেন না। সেটা আমার চিন্তা।

মানিক আর কিছু বলল না, রবীন্দ্রনাথের ছবিটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল,

আপনি রবীন্দ্র-ভক্ত?

নাহ্, গান-সাহিত্য কিছুই পছন্দ করি না আমি। এই ছবিটা একজন উপহার দিয়েছে। আমার বউয়ের ছবি ছিল আগে এখানে। তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথকেই বেশি মানাচ্ছিল এই ঘরে, তাই বউ সরিয়ে রবীন্দ্রনাথকেই টানিয়ে দিলাম।

মানিক অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল, বলল—

কিন্তু আপনার কথা শুনে আপনাকে বেশ ইন্টেলেকচুয়াল মনে হয়।

থুইনুক্র চোখ বুজল, নস্টালজিয়ায় ভোগা মানুষের মতো মুখে একই সাথে তৃপ্তি, অতৃপ্তি এবং হতাশা ফুটে উঠল। তার নষ্ট চোখটা বন্ধ হওয়ায় তার চেহারায় মাধুর্য ফিরে এসেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—

ভালো ছাত্র হিসেবে রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটিতে আমার বেশ নাম ছিল। আমার জাতীয়তা নিয়ে আমি নিজেই সন্দিহান ছিলাম। বাবা-মা বাংলাদেশে ছিল, কিন্তু আমি মনে-প্রাণে বার্মিজ। শেষ বছরে আমার বসন্ত হয়, বাংলায় সবচেয়ে সুন্দর ঋতু বসন্ত কিন্তু রোগ হিসেবে এটা ততটাই খারাপ। ক্যাম্পাসে আমাকে নিষিদ্ধ করা হলো। মানুষের চোখের ঘৃণা সইতে না পেরে বাবা-মায়ের কাছে চলে এসেছিলাম। আমাকে সেবা করতে গিয়ে তাদেরও এই অভিশাপ ভোগ করতে হলো। বসন্ত তাদের গ্রাস করেছে কিন্তু আমি বেঁচে গিয়েছিলাম অলৌকিকভাবে কিন্তু চোখটা খোয়াতে হয়েছিল। সুস্থ হওয়ার পরে পাহাড় ছেড়ে শহরে গিয়েছিলাম, টিকতে পারিনি। নাক বোঁচা পাহাড়িদের মানুষ ভিন গ্রহের মানুষের মতোই দেখে। জাপানি ভাষা নকল করে আমার সাথে কথা বলত মানুষেরা।

আশেপাশের মানুষেরা আমার নাম দিয়েছিল, জাপানি মূলা। জাপানি মূলা হওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না, আবার পাহাড়ে চলে আসলাম। সেই শহরে টিকতে না পারা মানুষগুলো, নিজের ভিটাতে পরাজিত আর অপরাধী মানুষগুলোও চলে এলো পাহাড়ে। পাহাড়ে নিজেরা জায়গা করতে পাহাড়িদের জায়গা দখল করতে শুরু করল, বাঙালি স্যাটেলাররা অত্যাচার করে পাহাড়িদের তাড়িয়ে দিচ্ছিল। তাদের বাঁচানোর মতো কোনো সরকার কিংবা দেবতা ছিল না। আমি তখন যোগ দেই সদ্য লারমার জেএসএসএ। তখন থেকেই বিডিআর, সরকারের শত্রু আমি। তাতে আমার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই, কারণ অনেক শত্রু পেয়েছি কিন্তু পাহাড়িরা আমাকে বন্ধুই মনে করে।

মানিক চুপচাপ শুনছিল। থুইনুক্র একটু থামতেই বলল—

জেএসএসএ থাকতে আপনি কেন আলাদা সংগঠন করলেন?

থুইনুক্র বলল—

কারণ জনসংহতি সমিতি নিজেদের সংহতির জন্যই বেশি উৎসাহী ছিল। তারা লোভে পড়ে গিয়েছিল, টাকার জন্য অপহরণ করে আবার লুটপাট, চাঁদাবাজিও করে। পাহাড়িদের কাছ থেকেও চাঁদাবাজি করেছে ওরা। ওরা প্রভু হতে চায়। কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সংগঠনে। তাই আমি আমার লোকদের জন্য সংগঠন করেছি, কোনো নাম নেই

আমার সংগঠনের। বিতাড়িত পাহাড়িদের আশ্রয় দেই আমরা, আর যারা আমাদের পাহাড়ের উপর আক্রমণ করে আমরা তাদের ছেড়ে দেই না।

মানিক বলল—

আপনার কিছু হলে এদের হাল সামলাবে কে?

থুইনুপ্রু বলল—

কেউ না কেউ ঠিকই দাঁড়িয়ে যাবে, আমার ভাইয়ের ছেলে মংতো আছে, ক্রাসিমা আছে। এরাই তো ভবিষ্যৎ।

মানিক কপাল কুঁচকে বলল—

এতগুলো মানুষ এখানে থাকে, পনেরোটা গ্রাম, এদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হয় কীভাবে?

থুইনুপ্রু বলল—

এরা জুম চাষ করে, শিকার করে আর...।

হঠাৎ থেমে গেল, চোখ খুলে মানিকের দিকে তাকাল, দৃষ্টিহীন চোখটি হিংস্র দেখাচ্ছে, সেটি একেবারে অকাজের নয়। তারপর গম্ভীর গলায় বলল—

আমি কথা দিচ্ছি আপনার কোনো অসুবিধা হবে না এখানে, যদি আপনি চান। কিন্তু আপনি যদি নিজেই নিজের ক্ষতি করতে চান, আমার কিছু করার থাকবে না। আপনার কী কী লাগবে লিখে দিন। কিছু মনে না করলে এখন যান, বিশ্রাম নেন। আমারও ক্লান্ত লাগছে।

মানিক মন খারাপ করল না, রবীন্দ্রনাথের ছবিটা আরেক দফা কাছ থেকে দেখে বেরিয়ে গেল।

ছোট ছোট কুটিরগুলো পাশ কাটিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মানিক। নতুন প্রেমে পড়লে অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে স্বপ্ন দেখে একসাথে এরকম নির্জন কুটিরে দুজন মিলে থাকবে। দোকান বাকি করে মাস চালাতে হবে না যেখানে, মাস শেষে বাড়িওয়ালার ভয়ে রাত করে বাসায় ফিরতে হবে না, টানাটানির সংসারে দূরের আত্মীয়স্বজনরা হানা দিবে না, নতুন গহনা দেখিয়ে পাশের বাসার ভাবি মনে জ্বালা ধরাবে না, গভীর রাতের আদরের স্পর্শে গরমে ঘামে ভেজা চটচটে শরীর অরুচি ধরাবে না।

উদাস ছেলেদের এই স্বপ্ন দেখতে প্রেমিকার প্রয়োজনও হয় না। নির্জনে সবুজ কুটির তাদের সবসময়ই হাতছানি দেয়। কিন্তু এই স্বপ্নগুলো কখনোই বাস্তব হয় না। মানিক কখনো এমন স্বপ্ন দেখেনি, তবুও তার উপর স্বপ্নটা যেন বাস্তব হয়ে আরোপিত হলো।

এখানে বলিপাড়ার মারমা বসতির মতো কর্মচাঞ্চল্য নেই, অভাব নেই, ভয়ও নেই। মেয়েরা মন চাইলে দাওয়ায় বসে তাঁত বুনে নয়তো উদাস মুখে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে। বৃদ্ধরা লম্বা বাঁশে গুড়গুড় করে তামাক টেনে সময় পার করে।

বাচ্চারা বসে নেই, তাদের ব্যস্ততা সবচেয়ে বেশি। খানিক আমলকী গাছে উঠে গাছের সব আমলকী পেড়ে ফেলে, নয়তো বেঁধে রাখা শূকরটাকে ছেড়ে দিয়ে সেটার পিছনে সবাই দৌড়ায়, দলবেঁধে ঝরনায় চলে যায়, সারা দুপুর গোসল করে, পিচ্ছিল পাথরে গড়াগড়ি করে। সন্ধ্যা নাগাদ আবার ধুলোবালি মেখে মায়ের বকুনি খায়।

কিন্তু পুরুষদের সংখ্যা বেশ কম এখানে, এদের মধ্যে কেউ কেউ জুম চাষ করতে পাহাড়ে চলে যায়। নিতান্ত অবহেলায় তারা জুম চাষ করে, ঘাড়ে করে চুপড়ি আলু নিয়ে আসে সন্ধ্যায়। সেই আলু পড়ে থাকে নিচে খোঁয়াড়ের পাশে। মনে হয় যেন এই চাষ করা প্রয়োজন নয় অভ্যাস। আসলেই প্রয়োজন নয়, এখানে কোনো অভাব নেই।

মংতো আরো দুজনকে সাথে নিয়ে পুঁটলিতে খাবার বেঁধে কাঁধে বাঁশের বৈঠা নিয়ে চলে গেল। তারা নদী দিয়ে যাবে, নদী নিশ্চয়ই বেশি দূরে না। হয়তো এ জন্যই ওষুধপথ্য আনাতে দুই দিনের বেশি লাগবে না। কিন্তু তাকে কেন পাহাড়ি পথে তিন দিন ধরে হাঁটিয়ে আনা হলো? নিজের মনে প্রশ্ন করেই উত্তর পেয়ে গেল মানিক। নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে বিডিআর চেক পোস্ট আছে। এক মুহূর্তের জন্য চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার।

সন্ধ্যা হতেই আগুন জ্বালানো হলো সবচেয়ে বৃদ্ধা বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার আঙ্গিনায়। সবাই গোল হয়ে বসেছে। বৃদ্ধার পাশে বসার জন্য একটা ছোটখাটো প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। বৃদ্ধা এই প্রতিযোগিতা দেখে খুব তৃপ্তি অনুভব করে, মুখে কৃত্রিম রাগ এনে বকে দেয় সবাইকে। সে বকাতেও স্নেহ এবং প্রশ্রয় থাকে। নিজের জানালাবিহীন ঘরের বারান্দায় বসে সব দেখছিল মানিক। সে ভাবছিল সাঙ্গু নদী নিয়ে, যেটাকে অনেকে শঙ্খ নদী বলে। সেই নদীই তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে। হঠাৎ কোথা থেকে কাজাচাই উদয় হলো। তাকে টেনে নিচে নিয়ে গেল, মানিক আপত্তি করল, কিন্তু কাজাচাই তা শুনল না, শোনার ক্ষমতাও তার নেই।

মানিক আর কাজাচাই ক্রাসিমার পাশে গিয়ে বসল, বৃত্তটা পূর্ণ হলো। আগুনের লালচে আভাটা সবার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। বৃদ্ধা গল্প শুরু করেছেন, স্বপ্নাহত মানুষের মতো সবাই এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বৃদ্ধার দিকে, মনোযোগ দিয়ে শুনছে আদিকালের কোনো এক গল্প। মানিক আর কাজাচাই শুধু মানুষের মুখ দেখছে, এই আসরে তারা দুজন শুধু মূর্খ। সবার মুখ দেখেই যেন তারা গল্পটা বুঝে নিল, মানিক ক্রাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, আগুনের আলো তার মুখে ঢেউ খেলছে। তার মুখটাকে শরতের আকাশের মতো দেখাচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে। মানিক একদৃষ্টিতে সে আকাশে তাকিয়ে আছে, গল্পটা বেশ বুঝতে পারছে এখন। হঠাৎ ক্রাসিমার মুখটা লাল হয়ে উঠল, বৃদ্ধা তার যৌবনের গল্প করছেন। ক্রাসিমা বৃদ্ধা থেকে চোখ ফিরিয়ে মানিকের দিকে তাকাল, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা দুটি চোখ তার মুখ পড়ছে। ক্রাসিমা আরো রাঙা হয়ে গেল। মানিকও মনে মনে লজ্জিত হলো, নিজের অসচেতন-অবিবেচক চোখ দুটিকে অভিশাপ দিতে লাগল। কে যেন গান ধরল, মারমা ভাষায়। দুই-একটা পাখির ডাক এদিক-সেদিক থেকে ভেসে আসছিল, বাকি সব কিছু নীরব। বাতাসও যেন থমকে

গিয়েছিল, এই পাহাড়ি গ্রামে করুণ সুরে গান শুনে। গানের একটা কথাও মানিক বুঝেনি, কিন্তু তার বুকে উথাল-পাথাল ঢেউ বইয়ে দিল সুরটা। গান শেষ হওয়ার পরও কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল সবাই, রেশটা শেষ করতে চায়নি কেউ, নীরবতাটাও যেন গানেরই অংশ। মানিক ঘাড় ঘুরিয়ে আড়চোখে ক্রাসিমার দিকে তাকাল, তার গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এসেছে, মুহূর্তে ভুলে গেছে সে।

আসর শেষ হয়েছে অনেক আগেই, কাজাচাই মানিককে ছেড়ে যাবে না। সে মানিকের ঘরে ঘুমাচ্ছে, সবাই ঘুমাচ্ছে। শুধু মানিক জেগে আছে। বারান্দায় বসে দীর্ঘশ্বাসের হিসাব মিলাচ্ছে। ক্রাসিমার ঢেউ খেলা চেহারাটা বারবার মনে পড়ছে, দীর্ঘশ্বাসগুলোও আরো গভীর হচ্ছে। হঠাৎ রাতের অন্ধকার চিরে একটা কান্না ভেসে এলো তার কানে। একি কোনো অশরীরী, যার বেদনাহত আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে পাহাড়ে? আবার শুনল, তার ঘরের পেছনে আমলকী গাছের আড়ালে ছোট একটা পরিত্যক্ত ঘর আছে। সেখান থেকে কান্না ভেসে আসছে। সন্তানহারা মায়ের কান্না।

থুইনুপ্রু মানিকের দিকে না তাকিয়েই সিগারেট টেনে চলেছে, ফাইভ ফাইভ সিগারেট। পাতার বিড়ি ফুঁকা পাহাড়িদের কাছে বিলাসিতাই বটে। গতকালের প্রচ্ছন্ন হুমকিটা ভুলেনি সে, তার মাথায় খেলা করছে মুক্তির চিন্তা। পাহাড় পেরিয়ে সাঙ্গু নদীর ঘাট, তারপর মা। থুইনুপ্রুর দিকে তাকিয়ে বলল—

এখনো লাল আছে, ক্ষতটা কালো কিংবা সবুজ হতে শুরু করলেই বিপদ। আর একদিন ব্যাথাটা সহ্য করুন, আমার মনে হয় আপনার পা ঠিক হয়ে যাবে।

একটা সাদা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল পা-টা। খায়াচিং আরো কিছু পাতা নিয়ে ঘরে ঢুকলো তার পেছনেই ক্রাসিমা। ক্রসিমাকে দেখেই মানিকের বুকটা যেন ভারী হয়ে গেল, সব স্বাভাবিকতা এলোমেলো হয়ে গেল, গতকাল রাত থেকেই সব এলোমেলো হয়ে গেছে। এই ক্রাসিমা যেন সেই আগের ক্রাসিমা নয়। মানিক নিজেকে সামলে খায়াচিংকে বলল—

এখন আর কোনো পাতা লাগবে না।

খায়াচিং কিছু বলল না, তার বোধ হয় একটু মন খারাপ হলো, সে পাতাগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল। মানিক আর ক্রাসিমার দিকে তাকাল না, থুইনুপ্রুকে বিশ্রাম করতে দিয়ে সে বেরিয়ে এলো। তারপর ক্রাসিমার হাতের দিকে তাকিয়ে বলল—

আর কোনো পাতা লাগবে না তো, ওগুলো ফেলে দাও।

ক্রাসিমা একটু হেসে বলল—

এগুলো আপনার জন্য, আপনি রাতে ঘুমাতে পারেন না, কাজাচাই বলেছে। খায়াচিং বলেছে এই বেল পাতা বালিশের নিচে রাখলে ঘুমের আর কোনো সমস্যা হবে না।

মানিক ক্রাসিমার দিকে তাকিয়ে বলল—

আমার বালিশের নিচে বেল পাতা রাখলে কি কাজাচাই-এর নাকডাকা বন্ধ হবে?

ক্রাসিমা খিলখিল করে হেসে দিল, মানিক অপলক দেখল সে হাসি, এত সুন্দর করে হাসতে আর কাউকে দেখেনি সে।

ক্রাসিমা হাসি থামিয়ে বলল—

শুধু কাজাচাই-এর নাকডাকার জন্যই ঘুমাতে পারেননি?

মানিক বলল—

না ঠিক তা নয়। কান্নাও শুনেছিলাম, গভীর রাতে কে যেন কাঁদছিল।

ক্রাসিমার মুখটা মুহূর্তেই বদলে গেল, বিষাদ ভর করল তার উচ্ছল চেহারায়। বলল—

উমে, খুব দুঃখী মেয়ে। দিনে কাঁদে না কেউ শুনে ফেলবে সেই ভয়ে। সবাই ঘুমিয়ে গেলে মনের দুঃখে কাঁদে।

মানিক বলল—

কী হয়েছে তার?

ক্রাসিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—

তার সন্তানের মৃত্যুর দিন গুনছে।

মানিক ভ্রূ কুঁচকে বলল—

মানে?

ক্রাসিমা বলতে লাগল—

উমে থাকত নাইক্ষ্যংছড়িতে। বাবা মা ছিল, ছোট একটা ভাই ছিল। সবাই মরেছে বাঙালি স্যাটেলরদের হাতে। আর্মির বন্দুক তাদের বাঁচায়নি, তামাশা দেখেছে। তাকেও মেরে ফেলেছিল, কিন্তু উমের দুর্ভাগ্য সে মরেনি। পনেরোটা নগ্ন লাশের উপর শুয়ে ছিল সে, যারা ধর্ষণ করে তার গলা টিপেছিল, তারা আর একটু ধৈর্য্য ধরলেই মেয়েটা বেঁচে যেত, মানে মরে যেত। সে মরেনি, তবে মরতে চেয়েছিল, মেয়েটা আমাকে সব বলেছিল। এখানে এসে যখন জানলো তার পেটে আরো একটা জীবন আছে তখন আর মরতে পারেনি সে। কিন্তু কোনো বাঙালির সন্তানকে পাহাড়িরা মেনে নেবে না। তারা উমেকে আশ্রয় দিয়েছে তার বাচ্চাকে নয়। বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথেই বাচ্চাকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হবে। উমে প্রতি রাতেই তার পেটে হাত বুলিয়ে কাঁদে, যত দিন তার সন্তান তার পেটে আছে তত দিন সে নিরাপদ। একটা দিন চলে যায় আর একটা দিন কমে যায় তার বাচ্চার জীবনের।

বলতে বলতেই ক্রাসিমার চোখ ছলছল করে উঠল। মানিক বলল—

কেউ কি এত নিষ্ঠুর হতে পারবে? এটা তো উমেরও সন্তান, সে তো পাহাড়ি। হয়তো বাচ্চা হওয়ার পর একজন পাহাড়ির সন্তানকে নদীতে ভাসানোর কথা কারো মাথায়ই আসবে না, সবাই ভুলে যাবে।

ক্রাসিমা বলল—

না ভুলে যাবে না, কোনোদিন ভুলেনি।

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, তখনি চিৎকার করে এলোমেলো চুলে একটা মেয়েকে দা হাতে নিয়ে ছুটতে দেখা গেল। মেয়েটার চুলগুলো ঘরের ছাদ থেকে ঝুলে পড়া ছনের মতো, ধূলিমাখা খামি পরে আছে, তার বুক খোলা, সে থুইনুফ্রুর নাম ধরে ডাকছে—

সম্ভবত তার জন্যই এই দা। হঠাৎ মানিকের সামনে এসে থেমে গেল, তার দিকে তাকিয়ে বলল—

আমার পোলা কই? আমার দুধ খাইব কে? তার ভুক লাগে না?

খায়াচিং পেছন থেকে ছুটে এসে দা-টা হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। মেয়েটির বুকটা ঢেকে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে গেল। বার দুয়েক হাত দিয়ে চোখ মুছল সে। মানিক হতবিহ্বল হয়ে আছে, খায়াচিং-এর চলার পথের দিকে দৃষ্টি রেখেই বলল—

এই মেয়েটা কে?

ক্রাসিমা বলল—

উথাই।

উথাইয়ের দা হাতে করে ছুটে চলা আর তার পেছনে খায়াচিং, দৃশ্যটি এই গ্রামে সবচেয়ে পরিচিত দৃশ্য। প্রথম প্রথম সবাই আঁতকে উঠত, বাচ্চারা ভয়ে মায়ের পেছনে লুকাত, বাঁশের হুঁকো ফেলে বৃদ্ধরা ছুটে আসত, মহিলারা চেঁচামেচি করে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ করে তুলত। এখন খায়াচিং ছাড়া কেউ বিচলিত হয় না, থুইনুপ্রুও না। উথাই থুইনুপ্রুর সামনে পড়েছিল একদিন, থুইনুপ্রুর গাম্ভীর্যের কাছে টিকতে পারেনি, হাত থেকে দা ফেলে কেঁদে দিয়েছিল। সেই থেকে সবাই নিশ্চিন্ত হয়েই থাকে। থুইনুপ্রু তাদের মাথা, তিনিই সবচেয়ে ভালো বুঝেন। গ্রামের প্রতিটা মানুষ এই কথাটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে।

পাঁচ মাসের সন্তান পেটে নিয়ে উথাই তখন বিতাড়িত। খায়াচিং ছাড়া সবাই ফিরিয়ে দিয়েছে। খায়াচিং উথাইকে নিয়ে চলে এসেছিল এই গ্রামে। কিন্তু থুইনুপ্রুর কাছে কিছু লুকাবার উপায় নেই, সে ঠিকই উথাইয়ের ইতিহাস জেনেছিল। তবুও সে দয়া করে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। শর্ত ছিল বাচ্চাটাকে নষ্ট করতে হবে, সবার হৃদয় কেঁপে উঠেছিল, একটা নিষ্পাপ, নির্দোষ শিশুকে হত্যা করা হবে ভেবে। থুইনুপ্রু সেদিন গলা উঁচু করে বলেছিল, আমরা যুদ্ধ করছি, আমাদের শত্রু আমরা চিনি। ঘরে শত্রু নিয়ে যুদ্ধ চালানো যাবে না। তারা এভাবেই আমাদের শেষ করতে চায়। এরকম মন নরম করে রাখলে একটার পর একটা ঘটনা ঘটতেই থাকবে, কত পাহাড়ি মেয়ে ধর্ষিত হচ্ছে প্রতি বছর? তারা পরিকল্পনা করে এসব করছে। তাদের বীজ আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। একসময় মারমা-পাহাড়ি কিছুই থাকবে না, থাকবে শুধু বাঙালি।

সবার চোখের সামনে যেন সব ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে গেল, বৃষ্টি শেষে সবুজ পাহাড়ের মতো। মনের ভেতর একটু খচখচানি থাকার পরও থুইনুপ্রুর কথার উপর কেউ কথা বলতে পারে না, সে-ই সবচেয়ে ভালো জানে, ভালো বুঝে, সে-ই তাদের মধ্যে একমাত্র ছিক্কিত (শিক্ষিত)।

আংসাই নিজ হাতে নদীতে ডুবিয়েছিল বাচ্চাটাকে। উথাই জানতেও পারেনি তার ছেলে হয়েছিল নাকি মেয়ে? সেই শোক সে ভুলেনি, একবারও দুধ খাওয়াতে পারেনি তার সন্তানকে। উথাইয়ের চোখে সে জ্বালা আগুন হয়ে জ্বলে। চোখে পানি নেই তার,

থাকলে হয়তো আগুন কিছুটা হলেও নিভত। নদীর পানির বুদবুদে তার বাচ্চার চিৎকার থেমে গিয়েছিল, দুধের জায়গায় মুখে নদীর পানি ঢুকেছে। যে নদী মায়ের বুকের দুধের মতো পাহাড়িদের জীবন বাঁচায়, সে নদী তার সন্তানকে হত্যা করেছে, আরো কত সন্তানকে না জানি হত্যা করেছে। থুইনুপ্রুই সাঙ্গু নদীকে খুনি করেছে, তার জন্যই সব ক্ষোভ উথাইয়ের কিন্তু সে খুনি হতে পারে না। পারলে অনেক আগেই থুইনুপ্রুর বসন্তের দাগে ভরা মুখটি রক্তে ভেসে যেত।

শীতকাল নয় এখন কিন্তু কুয়াশার শীতল পরশ অনুভব করছে মানিক। কুয়াশা কেটে সে হাঁটছে, একটু পরেই বুঝতে পারল এগুলো কুয়াশা নয়, মেঘ। বৃষ্টি হওয়ার আগে সব অহংকার ছেড়ে দিয়ে মেঘ পাহাড়ে নেমে আসে। পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকে, যেন অভিমান ভাঙাচ্ছে পাহাড়ের। মানিক বাতাস টেনে বুক ভরে মেঘ ঢুকিয়ে নিল। ভোরবেলার মেঘের মঞ্চে আরো দুটি চরিত্র আছে, একজন জানালা দিয়ে তাকিয়ে নিজের বাবাকে খুঁজছে মেঘে, প্রতিদিন চোখ পাতে সে এই পথে। মানিককে দেখে এক মুহূর্তের জন্য উচ্ছল হয়ে গিয়েছিল, মনে হলো যেন বাবার ছায়া খুঁজে পেয়েছে। আরেকজন বাকি দুই চরিত্রের চোখ আড়াল করে মেঘের আবরণে হেঁটে চলেছে মানিকের পিছু। পাহাড়ের উপর গিয়ে দাঁড়াল মানিক, চোখ ছোট করে খুঁজছে আঁকাবাঁকা একটা রেখা, সাঙ্গু নদীর রুপালি স্রোতের রেখা। মেঘের জন্য দৃষ্টি বেশি দূর যায় না, তবুও মানিক দাঁড়িয়ে থাকে, মেঘ ভরে নেয় বুকে।

মেঘ কাটতে শুরু করেছে, কোথাও গিয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরবে হয়তো। মানিক দেখল, তার পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানিক ক্ষণিকের জন্য আঁতকে উঠল। মেঘের পর্দার জন্য এতক্ষণ দেখা যায়নি মেয়েটাকে। মুখে কোমল, নিষ্পাপ ভাব আছে, তার গালে দুটি অশ্রু রেখা দেখা যায়, এই দাগ বোধহয় আর মুছবে না। মেয়েটির পেট দেখে বুঝা যায়, সে সন্তানসম্ভাবা। মানিক কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

তোমার নাম কি উমে?

মেয়েটি ঘাড় কাত করল, তারপর চুপ করে রইল। মানিক বলল—

কিছু বলবে আমাকে?

মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে দিল, দুই হাত একসাথে করে মাথা নুইয়ে বলল—

আমার বাচ্চাটারে বাঁচান ডাক্তার বাবু।

মানিক ইতস্তত করে বলল—

আমি কী করে বাঁচাব বলো, আমি নিজেই মরতে বসেছি।

উমে বলল—

আপনি পারবেন বাবু, আপনি শুধু ঐ থুইনুপ্রুর ওষুধে একটু বিষ মিশাইয়ে দিলেই হবে, কেউ কিছু বুঝব না।

মানিক মাথা নাড়িয়ে বলল—

না আমি তা পারি না, আমি ডাক্তার, খুনি নই। আমি মানুষ মারি না, বাঁচাই।

হঠাৎ উমে মানিকের হাতটা ধরে তার পেটের উপর রাখল, বলল—

ডাক্তার বাবু, এইটাও মানুষ। এইটারে বাঁচান। আমার আর কেউ নেই বাবু, এইটা ছাড়া।

মানিকের শরীর শিহরিয়ে উঠল, বাচ্চাটা নড়ছে। দূরে একটা গুঞ্জন শুনে দুজনেই সচকিত হয়ে তাকাল, পাহাড়ের গা বেয়ে কিছু মানুষ নেমে আসছে। অনায়াসে বড় বড় বোঝা নিয়ে মারমা ভাষায় ছড়া কাটতে কাটতে পাহাড় বেয়ে আসছে তারা, সবার সামনে মংতো। উমে মানিকের দিকে আকুতি মাখা দৃষ্টি দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

থুইনুপ্রুর মুখে খুব কম মানুষ হাসি দেখেছে, মানিক তাদের মধ্যে একজন। নিজের পা-টা একটু নাড়াতে পারছে সে, ব্যথাটা অনেক কম এখন। মানিক সাধারণত অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলে না থুইনুপ্রুর সাথে, থুইনুপ্রুও বলে না। কিন্তু আজ সে নিয়ম ভঙ্গ করল থুইনুপ্রু। একটু হেসে বলল—

ডাক্তার বাবু আপনার ফেরার সময় বোধহয় আর দেরি নয়।

মানিক গম্ভীর হয়ে বলল—

হুম আর বেশি দিন লাগবে না, আমার ভিজিট কি দিবেন না?

থুইনুপ্রু মুখে হাসিটা ধরে রেখেই বলল—

কী চান?

মানিক বলল—

উমের সন্তানের জীবন চাই।

মুহূর্তেই থুইনুপ্রুর মুখটা হিংস্র হয়ে উঠল, তার নষ্ট চোখটা পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরে বলল—

আপনি নিজের জীবন নিয়ে ফিরে যাবেন এটাই আপনার ভিজিট। আমাদের নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে আপনার কোনো কথা না বললেও চলবে, না হলে হয়তো এইটাও পাবেন না।

মানিক কিছু বলল না। চোয়াল শক্ত করে পায়ে ড্রেসিং করতে লাগল।

চঞ্চল ফিঙের মতো চট করে একপলকেই দিন উড়ে চলে যায় মানিকের। রাতটা মনে হয় অনাথ আশ্রমের খাবারের লাইনের মতো, একেবারে শেষে দাঁড়িয়ে থাকা মানিকের মনে হয় সে লাইন আর শেষ হবে না। উমের কান্না রাতের ক্লেশ আরো বাড়িয়ে দেয়।

ভোরবেলা সে মুক্তির পথ খুঁজে পাহাড়ে কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না, মাঝে মাঝে দূরে মেঘের দেয়ালে ক্রাসিমার চেহারাটা ভেসে ওঠে। নিজেকে ধিক্কার দেয় মানিক, কিন্তু তবুও চেয়ে থাকে মেঘের দিকে।

এই গহিন পাহাড়ে একটা দিন থেকে অন্য একটা দিন আলাদা করা যায় না, প্রতিদিন একই ঘটনা ঘটে এখানে। গুটি কয়েক পুরুষ ছাড়া এখানে শুধু নারী, বৃদ্ধ আর

বাচ্চারা থাকে। ঢাকার পাশে এরকম একটা গ্রামে গিয়েছিল মানিক। সেখানে কোনো পুরুষ নেই।

পরে শুনেছিল গ্রামে কার নামে যেন মামলা হয়েছিল, পুলিশ আসবে শুনে সব গ্রামছাড়া হয়েছে। বাচ্চারা ভূত প্রেত রাক্ষস ভয় পায়, আর বড় হলে পুলিশকে ভয় পায়। কিন্তু এই গ্রামে পুলিশের ভয় নেই, নারীদের মধ্যে আতঙ্ক নেই, শুধু কিছু মানুষ চোখ ভেজায় দুঃখে আর স্বস্তিতে, নিজের ঘর হারানোর দুঃখে আর নতুন ঘর পাওয়ার স্বস্তিতে। বাচ্চারাও মাঝে মাঝে পুরনো বন্ধুর স্মৃতিতে কাতর হয়ে পড়ে, খেলার সময় নতুন বন্ধুকে পুরনো বন্ধুর নামে ডেকে ফেলে, তারপর একটু নীরব হয়ে যায়, সেই পুরনো বন্ধুর রক্তমাখা চেহারা মনে পড়ে যায়। বুড়োরা হুঁকো টানে আর বুড়িরা শুধু গল্প করে, কেউ আশেপাশে না থাকলে নিজে নিজেই গল্প করে, তাদের গল্পগুলো বেশিরভাগই দুঃখের গল্প। নিজে নিজেই কেঁদে ওঠে গল্প বলতে বলতে।

কিন্তু আজকের দিনটা আলাদা। পায়ে শুকনো মাটি মাখা একটা পুরুষের দল গ্রামে হাজির হয়েছে। তাদের মুখে দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি আর যাত্রা শেষের তৃপ্তি দেখা যাচ্ছে। গ্রামে যেন রং লেগেছে, মলিন কাপড় ছেড়ে মেয়েরা রঙিন পাট ভাঙা থামি পরেছে, কপালে চন্দন ফোঁটা দিয়েছে, ঠোঁটে লাল জর্দা রং ছুঁইয়েছে, হাতে বৈসাবীর সময় কেনা চুড়ি পরেছে। বুড়িরা তবুও কাঁদছে তবে তা দুঃখের বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু বুড়োরা হুঁকো টানায় ইস্তফা দেয়নি, আনন্দে-দুঃখে এই হুঁকোই তাদের সব সময়ের সঙ্গী, সবচেয়ে আপন, সম্ভবত বউয়ের চেয়েও বেশি। তারা হাসি মুখে হুঁকো টানছে। বাচ্চাদের আনন্দের সীমা নেই, তারা উল্টাপাল্টা স্লোগানে একটা মিছিলও করে ফেলল। মিছিল জমল না, কারণ সবাই আলাদা আলাদা স্লোগান দিচ্ছে। মানিক অবাক হয়ে সব দেখছে, এত আনন্দ একসাথে দেখেনি সে কখনো। বাচ্চাদের মিছিল পেরুনো মাত্র ক্রাসিমা এলো। তার চুল রঙিন ফিতা দিয়ে বাঁধা, তাতে আবার নীল রঙের ফুল গোঁজা আছে। তার চোখ দুর্গার মতো নয়, কবিরা তার চোখের উপমা দিয়ে যাননি কিন্তু তার চোখে যা আছে তা হলো সাগুর গভীরতা আর ছলছল জল। মানিক সেখানে ডুবে যায় আবার ভাসে। হাবুডুবু খেতে খেতে সে ক্রাসিমাকে জিজ্ঞাসা করে—

আজ কী?

আজ উৎসব।

কিসের উৎসব?

আজ সব পুরুষেরা দক্ষিণের পাহাড় থেকে ফিরে এসেছে, অনেক দূরে পাহাড়ের পাশে সমতল জায়গায় চাষবাস করে তারা। ওখানেই থাকে বছরের ছয় মাস। ওরা ফিরে আসলে উৎসব হয়। আমারও এটা প্রথম উৎসব।

তোমার চুলে এটা কী ফুল?

এটার নাম নীলাতা, মংতোদা এনে দিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় আসল উৎসব শুরু হবে, মংতোদা বাঁশি বাজাবে। উনি খুব ভালো বাজায়, যে কেউ শুনলে থমকে যায়। আমার উপর খাবারের দায়িত্ব পড়েছে, আমার খুব ভয় লাগছে। আচ্ছা এখন যাই।

কেন যেন মানিকের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ক্রাসিমার নতুন জামা, চুলের ফিতা আর নীলাতা ফুলের উৎসে যে একই তা মানিক ক্রাসিমাকে না জিজ্ঞাসা করেই বুঝে ফেলল। সবার মধ্যে একটা কর্মব্যস্ততা, সবাই কিছু না কিছু করছে। কিন্তু মানিকের কিছু করার নেই, সে বাঁশিও বাজাতে জানে না, সে তাদের লোক নয়। সে এক বন্দি ডাক্তার, যে পালানোর ফন্দি আঁটছে।

সন্ধ্যাটায় রং আরো বেড়ে গেল। আগুনের কুণ্ডলীটাকে কেন্দ্র করে বৃত্তটা আজ অনেক বড়। থুইনুপ্রুকে আনতে গিয়েছিল মংতো, কিন্তু সে আসেনি। সে আর উমে ছাড়া বাকি সবাই আছে এই বৃত্তে। খাবার দেয়া হলো, মুরগি আর চালতার একটা স্যুপ বানানো হয়েছে, সবজি দিয়ে একটা পদ বানানো হয়েছে যেটার নাম তোহজা, আর নাপ্পির তরকারি যেটা শুঁটকি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। গোল করে পাতার বাসনে সবাই খেল, আহামরি কিছু হয়নি কিন্তু সবাই চেটেপুটে খেলো। চেটেপুটে খাওয়ার দৃশ্যটা ক্রাসিমা মন ভরে দেখল। মানিকের দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি আজ সে, মানিক বারবার একটা দৃষ্টির জন্য মুখিয়ে ছিল, একটা হাসি ভরা দৃষ্টিতে তার উৎসব হয়ে যেত। কিন্তু ক্রাসিমা তাকায়নি। তারপর তামাক খেল সবাই, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তামাক খেল, মানিকের দিকে কেউ হুঁকো এগিয়েও দিল না, দিলেও খেত না সে, মানা করত, তখন হয়তো ক্রাসিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত। কিন্তু মানা করার সুযোগটাও সে পেল না, তার মনে এই বিগ্রহ কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল। ক্রাসিমা একবার হুঁকোতে টান দিয়েই কাঁশতে লাগল আর তার কাঁশি দেখে সবাই হেসে অজ্ঞান। ক্রাসিমা মংতোর পাশেই বসেছিল, ইচ্ছে করে বসেছে নাকি উপর থেকে কেউ এই দুটি প্রাণীকে এই বিশেষ মুহূর্তে একসাথে এনে ফেলেছে কে বলতে পারে। দক্ষিণের পাহাড় থেকে আসা পুরুষেরা তাদের বউয়ের পাশে বসেছে, তাদের মুখগুলো লাজুক লাজুক। এদিক-সেদিক দেখার ভান করে একজন আরেকজনকে দেখছে। মংতো তার বাঁশি বের করল, সবাই চুপ হয়ে গেল। হাসির শব্দ নিমিষেই বাতাসে দ্রবীভূত হয়ে গেল। মংতো শুরু করল। কী হৃদয়কাড়া করুণ সুর, সুরে যেন পাহাড়ের গন্ধ লেগে আছে। ক্রাসিমা নেশাহত দৃষ্টিতে মংতোর দিকে চেয়ে আছে।

মানিকের মনে হলো এরা সবাই একটা পাখির পালক, একটার সাথে আরেকটার কী অদ্ভুত মিল, কী গোছানো! ক্রাসিমা আর মংতো যেন রঙিন সে পাখির একই রঙের দুটি পালক। ক্রাসিমা আর মংতোকে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তির মতোই লাগছে। মানিক নিজেকে আর আরোপিত করে পাখির পালকগুলোকে বেমানান করল না। সে উচ্ছিষ্ট, সারাজীবন তাই ছিল, এখনো তাই আছে।

সে চলে এলো আসর ছেড়ে, তাতে আসরের কোনো ক্ষতি হলো না। গ্রামের এক পাশে পাহাড়ে বসে আছে সে, চাঁদটার জন্য অপেক্ষা করছে। গ্রাম থেকে মৃদু কোলাহল ভেসে আসছে, নাচ-গান হচ্ছে এখন। মৃদু কোলাহলটা তার একাকিত্বটা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

ঘাসের উপর শরীরটাকে সঁপে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমছে।

কোলাহলটা ধীরে ধীরে মিইয়ে গেছে, মানিক খেয়ালও করেনি। মোহাবিষ্ট হয়ে আকাশ দেখছে সে। হঠাৎ চুড়ির শব্দে তার মোহভঙ্গ হলো, ক্রাসিমা এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। মানিক উঠে বসল। ক্রাসিমা মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল—

একা একা জোছনা দেখেন?

আমি একা একাই দেখি।

কিন্তু আমি কখনো একা দেখি না।

বলতে বলতেই মানিকের পাশে এসে বসল। ব্যস্ত রাস্তায় ছোট্ট ছেলেটার মতো রাস্তা পার হতে পারছে না যেন চাঁদটি। মেঘেরা ছুটে যাচ্ছে তার সামনে। পাহাড়ে মেঘের ছায়া পড়ছে, আবার সরে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে আবার টেনে নিচ্ছে। সেই চাদরের নিচে দুটি মানুষ চুপচাপ বসে আছে, তাদের মনে অনেক দ্বিধা, অনেক প্রশ্ন। মেঘেদের ষড়যন্ত্রেই কিনা, হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো, চাঁদটা মেঘকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বৃষ্টির বিন্দু বিন্দু ফোঁটা যেন এক একটি জোছনার কণা। মানিক-ক্রাসিমা দুজনেই অভিভূত হয়ে গায়ে জোছনা মাখছে। মানিক নিজের সংশয় জোছনায় ধুয়ে ফেলে বলল—

তুমি কি জানো মংতো তোমাকে অনেক পছন্দ করে?

আমাকে সবাই পছন্দ করে।

তোমাকে আর মংতোকে পাশাপাশি খুব মানাবে।

সবাই তো তাই বলে।

তুমি কি বলো?

ক্রাসিমা কিছু বলল না, দুই হাত ছড়িয়ে ঘাসে শুয়ে পড়ল, চাঁদের কণা গায়ে মাখতে লাগল। মানিকও শুয়ে পড়ল দুই হাত ছড়িয়ে, সে জানতেও পারল না, ক্রাসিমার চোখের কোণে শুধু বৃষ্টির জল পড়িয়ে পড়ছে না, সেখানে অশ্রুও ছিল।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, মেঘেদের দৌরাত্ম্য শেষ। জোছনা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো পাহাড়ে। সব কিছু আরো স্পষ্ট, আরো পবিত্র লাগছে। ক্রাসিমা মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল—

আপনি সব সময়ই একা একা জোছনা দেখেন? কোনো সঙ্গী নেই আপনার? আমি বাবার সাথে দেখতাম।

আমি তো অনাথ, কোনো আপনজন নেই, সঙ্গী নেই।

কেউ আপনাকে আপন করতে চায়নি?

জানি না কিংবা বুঝিনি, আমি তখন আমাকে খুঁজছিলাম।

একটু থেমে মানিক আবার বলা শুরু করল—

তখন আমি আমার মা-বাবাকে খুঁজে পেয়েছিলাম, চকের সাদা আঁচড়ে আর

কলমের কালিতে। অনাথ আশ্রমে সব কিছুই সীমিত, দোয়াতের কালিও তাই। আমার কালি সব মায়ের নামেই ঢেলে দিতাম। ক্লাসে লেখার জন্য কালি অবশিষ্ট থাকত না। পণ্ডিত বাবু দাঁড় করিয়ে রাখতেন। আমি জানতাম না পেছনের বেঞ্চে এক জোড়া চোখ আমার জন্য জল ফেলত। একদিন দেখি আমার বেঞ্চে কডলিভার তেলের শিশিতে এক শিশি কালি রাখা আছে। কালি পেয়েই আমি খুশি, পণ্ডিত বাবুর ক্লাসে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো না। প্রতিদিন একই ঘটনা ঘটতে লাগল। একদিন তাকে দেখলাম, আমার বেঞ্চে খালি শিশিটাতে কালি ঢালছে, আমার চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় দৌড়ে পালিয়ে গেল। পেছনের বেঞ্চের এই শ্যামলা মেয়েটিকে আগে কখনোই খেয়াল করিনি। যেদিন থেকে আমি পণ্ডিত বাবুর ক্লাসে বসে কাটাতাম সেদিন থেকে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকত তাও আমার চোখে পড়েনি। আমার রেজাল্ট খুব ভালো হলো, মেয়েটি ছিটকে পড়ল। একদিন লাজুক মুখে এসে আমাকে একটি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে গেল। চিঠিতে কিছুই লেখা ছিল না, সাদা চিঠি।

আমি কিছুই বুঝিনি। পরে বুঝেছিলাম, তার কাছে কালি ছিল না, সব তো আমাকেই দিয়ে দিয়েছে। তার চিঠি অসম্পূর্ণ ছিল না। সে কডলিভারের শিশিতে তার শব্দগুলো ভরে পাঠিয়েছিল। সাদা চিঠির অর্থ হলো আমি যা চাই লিখতে পারি, সব কিছু সে আমার উপরই সঁপে দিয়েছিল।

ক্রাসিমা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। মানিক থামতেই বলল—

সে এখন কোথায়?

মানিক আবার বলল—

একাত্তর সালে আমাদের আশ্রমে পাকিস্তানিরা হামলা করেছিল, সব কাগজপত্র নষ্ট করে দিয়ে যায়, তাতে খুব একটা সমস্যা হয়নি কিন্তু যাওয়ার সময় মেয়েদের নিয়ে যায়। মাসিরা অনুনয় করে বলেছিল, 'এরা বাচ্চা মেয়ে।' তারা শুধু হেসেছিল। সেই মেয়েরা আর আশ্রমে ফিরে আসেনি। তবে তার সাথে আমার আরো দুবার দেখা হয়েছিল। প্রথমবার, অতিরিক্ত সেজেছিল সে, ঠোঁটে লাল কড়া লিপস্টিক, পাউডারের কারণে তার শ্যামলা রংটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সে হতবিহ্বল হয়ে আমার চেম্বারে বসে ছিল। তার পোশাক-সাজ কিছুই তার দৃষ্টির সাথে মানাচ্ছিল না। সেই প্রথম আমি তার সাথে কথা বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছো? সে শুধু হাসল। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় থাকো?' সে বলল, 'আমি যেখানে থাকি সেখানের ঠিকানা ভদ্রলোকদের না জানলেই ভালো।' হাহাকার করেছিল মনটা। সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে তোমার।' সে বলল, 'কিছু হয়নি'। বলেই ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর অনেক দিন দেখিনি তাকে : যেদিন আবার দেখা হলো, সেদিন তার মুখে কোনো সাজ ছিল না—

তবুও শ্যামলা রংটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল, চোখে গাঢ় কাজল ছিল না, ঠোঁটে কোনো লিপস্টিকও ছিল না। সে দুটো খুন করেছিল, নিজের পেটের বাচ্চাকে আর নিজেকে। মর্গে শুয়ে ছিল সে। সেটাই তার সাথে আমার শেষ দেখা।

ক্রাসিমা ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে মানিকের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করল—

সে সাদা চিঠিতে আপনি কী লিখেছিলেন?

আমার মায়ের নাম, যদিও পরে জেনেছি সেই মা আমার জন্মের পঞ্চাশ বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি মা চেয়েছিলাম, মা পেয়েছিলামও।

ক্রাসিমা বলল—

পেয়েছিলেন মানে?

মানিক উঠে দাঁড়াল, মৃদু বাতাসে শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। ক্রাসিমার দিকে তাকিয়ে বলল—

তুমি জানতে চেয়েছিলে না সেই চিঠির কথা, যেটা আমার জামার পকেটে ছিল। তুমি চাইলে এখন তা পড়তে পারো।

মানিকের ঘরের বারান্দায় হারিকেন জ্বালিয়ে বসে আছে ক্রাসিমা আর মানিক। শুকনো চাদরে নিজেদের ঢেকে নিয়েছে তারা। সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, চারদিকে নিস্তব্ধতা। মানিক ভাঁজ খুলে চিঠিটি ক্রাসিমার দিকে এগিয়ে দিল। ক্রাসিমা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করল—

স্নেহাস্পদ মানিক,

এই চিঠি আমি গত বিশ বছর ধরে লেখার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারিনি। আমি দরিদ্র মানুষ, আত্মমর্যাদা ছাড়া কিছুই নেই আমার। নিজের বিবেকের সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আজ করলাম, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলাম না আজ। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলাম।

তোমার চোখেমুখে নিজের পরিচয়ের জন্য যে আকুতি আমি দেখেছি সেই তুলনায় আমার প্রতিজ্ঞা কিছুই না।

নিদারুণ কষ্ট হচ্ছে আজ আবার আনন্দও হচ্ছে। আমি এই চিঠি লিখেছি কিন্তু মনে মনে প্রত্যাশা করি কখনো যেন তা তোমার কাছে না পৌঁছায়। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এই করুণাটুকু আমায় করতেই পারে।

তোমার মাতামহের সাথে আমার পরিচয় ছিল, তার নাম ছিল নগেন্দ্র চক্রবর্তী। ব্রাহ্মণ ছিলেন, পূজা-অর্চনা করতেন। খুব রসিক মানুষও ছিলেন, আমি চায়ের দোকানে যেতাম শুধু উনার গল্প শুনতে। তার মেয়ে অর্থাৎ তোমার মা, ছিল তার মতোই উচ্ছল স্বভাবের, নাম ছিল চঞ্চলা চক্রবর্তী। নামের মতোই চঞ্চল ছিল সে। কিন্তু হঠাৎ চঞ্চলা কেমন কুঁকড়ে যায়, পেয়ারা গাছে ডাসা ডাসা পেয়ারা কিন্তু চঞ্চলার অবহেলায় সেগুলো গাছেই ঝুলে রইল, ঘুড়ি কেটে যায় কিন্তু তার পেছনে চঞ্চলা ছুটে বেড়ায় না। নগেন্দ্র বাবুও কেমন নির্জীব হয়ে গেলেন, চায়ের আড্ডায় আসেন না। আসলেও

অনিচ্ছায় দু' চুমুক দিয়ে আবার চলে যান। এর মধ্যেই আমি ঢাকায় অনাথ আশ্রমে চাকরি নিয়ে চলে এসেছি। একদিন রাতে হঠাৎ নগেন্দ্র বাবু অনাথ আশ্রমে উপস্থিত। তাকে দেখে অবাক হয়েছিলাম, খুশিও হয়েছিলাম। তাকে বসতে বলার সাথে সাথেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে দিলেন। আর বলতে লাগলেন "আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেল চন্দন।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম কী হয়েছে? তিনি বললেন, "তোমাকে বিশ্বাস করি, আপনও মনে করি তাই তোমার কাছেই আসলাম, আমাকে তুমি উদ্ধার করবে জানি"। তারপর বললেন, "চঞ্চলা সেদিন ঘুড়ির পেছনে ছুটতে ছুটতে কেশবপুর চলে গিয়েছিল, তুমি তো জানোই আমার মেয়েটি কেমন চঞ্চল। সে যে বড় হয়েছে তা সে বুঝে না, মনটা এখনো শিশুর।

সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। নদীর ধার ধরে সে একা একা আসছিল, তখনি কিছু জানোয়ার তার উপর হামলা করে" বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন তিনি। আবার বলতে শুরু করলেন "মেয়েটা আমার অনেক কষ্টে বাড়ি এসেছিল সেদিন, দুই দিন মূর্তির মতো বসে ছিল। তার মা তাকে জোরে কাঁদতে নিষেধ করেছে, পাড়া-পড়শি জানলে মেয়ের জীবন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই, মেয়ে যে আমার অন্তঃসত্ত্বা। মেয়েকে ঘরের ভেতরই রেখেছি এখন, সবাইকে বলেছি চঞ্চলা মামার বাড়ি গেছে।" তিনি তারপর বললেন, "এই বাচ্চা নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছি, মেয়ের জীবনের কথা চিন্তা করে শুধু বিষ খাওয়ানো বাদ রেখেছি, কিন্তু বাচ্চাটা নষ্ট হচ্ছে না। এই বাচ্চা আসলে আমাদের সমাজ ছাড়া হতে হবে, এই সন্তান যে পাপের সন্তান, জারজ সন্তান। এখন তুমিই আমাদের বাঁচাও। মানুষ খুন করতে পারলে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতাম কিন্তু সেই পাপ করে নরকে যেতে পারব না, তুমি এই বাচ্চাটার ব্যবস্থা করো অনাথ আশ্রমে। যদি কিছু পয়সা লাগে তো দিব, সাধ্যে যা আছে।

এই উপকারটুকু করো।" আমি বললাম "কিন্তু চঞ্চলা কি রাজি হবে?" নগেন্দ্র বাবু বললেন, "সে ভার তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও, সে কিছু জানবে না যদি তুমি কিছু না জানাও। তার মানসিক অবস্থা ভালো না, সে এখন কিছুই বুঝবে না। ভবিষ্যতে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলব, মৃত সন্তান হয়েছিল। তুমি ভাই আমায় কথা দাও, কাউকে কিছু বলবে না। ঈশ্বরের কাছে আজীবন তোমার জন্য প্রার্থনা করব" আমি কথা দিয়েছিলাম। আজ সে কথা ভাঙলাম। তোমাকে আশ্রমে আনার পর মাস ছয়েকের মধ্যে নগেন্দ্র বাবু পরিবার সমেত কোথায় যেন চলে যান। কাউকে কিছু বলে যাননি। চঞ্চলাকে আমি আর দেখিনি।

বুড়ো মানুষ, আর হয়তো বেশি দিন বাঁচব না। অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। তুমি যখন ছিলে তখন তো নিজেই এসে দেখে যেতে, এখন মাঝে মাঝেই হাসপাতালে যেতে হয়। সেদিন কী যেন হলো, অফিসেই মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। সবাই মিলে হাসপাতালে ভর্তি করে দিল। আমি যেদিন হাসপাতাল ছেড়ে আসছি সেদিন মহিলা ওয়ার্ডে একজন মানুষকে দেখে থমকে গিয়েছিলাম। বুড়ো হলেও আমার স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখরই আছে। বিছানায় শুয়ে আছে চঞ্চলা চক্রবর্তী, তোমার মা। অনেক বছর পেরিয়ে গেছে, মুখে বয়সের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে, অসুস্থ-অচেতন মুখ, তারপরও আমার চিনতে ভুল হলো না। তার স্বামী, ছেলে, মেয়েরা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে তোমারও থাকার কথা ছিল। তোমার কথা মনে হতেই সব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলাম। তাই তোমাকে আজ লিখতে বসেছি, তুমি যাতে অন্তত একবার হলেও মায়ের হাতের স্পর্শ পাও। মৃত্যু পথযাত্রী মায়ের শেষ দৃশ্যে যাতে তুমিও থাকো। মেডিসিন ওয়ার্ডের এগারো নম্বর বেডে সে আছে। তুমি যদি চাও নিজের পরিচয় দিতে পারো আর না চাইলে না দিতে পারো। সে সিদ্ধান্ত আমি তোমার বিবেকের উপর ছেড়ে দিলাম।

একটা কথা তোমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলি, কারো বীর্যে মানুষ জারজ হয়ে যায় না, পিতার পশুত্বে তুমি পশু হবে না। মানুষ হওয়ার জন্য পিতা লাগে না, মন লাগে, মনুষ্যত্ব লাগে।

এই বৃদ্ধকে যদি পারো ক্ষমা করে দিও। আমি অনাথ আশ্রম ছেড়ে গ্রামে চলে যাচ্ছি। অবশিষ্ট কয়েকটা দিন সেখানেই কাটাব। তোমার জন্য সারাজীবন আশীর্বাদ করেছি, বাকি জীবনও করব।

ইতি
চন্দন কুমার ভৌমিক
ঢাকা অনাথ আশ্রম

চিঠিটা পড়ে ক্রাসিমা মনের ভেতর মানিকের জন্য পৃথিবী সমান মমতা অনুভব করল। নিজের মধ্যে যতটুকু আছে সব উজাড় করে দিতে ইচ্ছা হলো। কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠিটি ফেরত দিয়ে চুপ করে বসে রইল। মানিক বলল—

ক্রাসিমা আজ রাতেই আমি চলে যাব। আমাকে যেতেই হবে।

আপনার মার কাছে যাবেন?

না মায়ের জন্য নয়, নিজের জন্য যাব। উমের সন্তানের জন্য যাব। বিডিআর ক্যাম্পে গিয়ে তোমাদের সংগঠনের কথা বলে দিব। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসব। তাতে হয়তো উমের সন্তানটা বাঁচবে। আমার সাথে উমের সন্তানটার কোনো পার্থক্য

নেই, আমরা দুজনেই জারজ। আরেকজনের দোষে এই বাচ্চার মৃত্যুদণ্ড কেন হবে? সে বাঁচুক মায়ের পরিচয়ে কিংবা নিজের পরিচয়ে।

ক্রাসিমা বলল, পাহাড়িদের কোনো ক্ষতি হোক তা চাই না। তবুও আমি চাই আপনি যান।

তোমার সাথে হয়তো আর দেখা হবে না।

হতেও পারে, তখন আমার হাতে হাতকড়া থাকবে। আচ্ছা আপনার মায়ের সাথে দেখা হলে কি আপনি আপনার পরিচয় দিবেন?

দিব, শুধু নিজের পরিচয় দিব। আমি ডা. মানিক, এটাই আমার পরিচয়।

ঠিক আছে, আপনার যাত্রা সফল হোক। শুভ কামনা ছাড়া আপনাকে দেবার মতো কিছুই নেই আমার।

বলেই ক্রাসিমা বারান্দা থেকে নেমে গেল, তারপর নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল। একবারও ফিরে তাকাল না। দুই-একবার শুধু হাত দিয়ে চোখ মুছলো। মানিক বারান্দায় ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল, যতক্ষণ ক্রাসিমার ছায়া দেখা যায়।

ক্রাসিমা সারারাত জানালার পাশে বসে ভোরের অপেক্ষা করেছে। আবছা আলোতে ঘাস মাড়ানো পথে চোখ পেতে আছে সে, প্রতিদিনের মতো। মনে মনে চাইছে এই পথ শূন্য থাক, তবুও সে চোখ ফেরাতে পারছে না। মন আর চোখ একে অপরের সঙ্গ ছেড়েছে।

দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল, ক্রাসিমা কিছুক্ষণের জন্য নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেল, বুকে রক্ত ছলকে উঠল আশা এবং আশঙ্কা দুটোই মনে প্রতিযোগিতা করতে লাগল। ধীর পায়ে দরজার কপাট খুলে দেখল মংতোর উদ্বিগ্ন মুখ। ক্রাসিমা মনে স্বস্তি পেল কিন্তু চোখ দুটি টলমল করে উঠল। মংতো ক্রাসিমাকে বলল—

ডাক্তার বাবু চইলা গেছে।

ক্রাসিমা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল—

জানি।

মংতো একটু আহত হলো, গতকাল রাতে ভরা জোছনায় ক্রাসিমা আর ডাক্তার বাবুকে দেখেছে সে, শুয়ে শুয়ে একসাথে ভিজেছে দুজন। মংতোও ভিজেছে, চোখের জলে কিংবা বৃষ্টির জলে। ডাক্তার বাবু নেই শুনে দৌড়ে চলে এসেছে ক্রাসিমার ঘরে, তার আশঙ্কা ছিল, ঘরটা খালি থাকবে। ক্রাসিমাকে দেখে মনে মনে খুশি হয়েছে কিন্তু যখন শুনলো, ডাক্তার বাবুর অন্তর্ধান সম্পর্কে ক্রাসিমা আগে থেকে জেনেও কাউকে কিছু বলেনি তখন সে আহত না হয়ে পারল না। এই পাহাড়ের চেয়ে কি সেই বাঙালি ডাক্তার তার কাছে আপন হয়ে গেল, তার 'পাহাড়ের কন্যা' নামটি কি সে ভুলে গেল? কিন্তু ক্রাসিমার উপর তার কোনো ক্ষোভ নেই, সেই ক্ষমতাও তার নেই। তার সব রাগ-ক্ষোভ চলে গেল মানিকের উপর। ক্রাসিমার দিকে তাকিয়ে বলল—

আমরা ডাক্তার বাবুকে খুঁজতে যাচ্ছি, উনি পথ চিনে সাদুত চলি গেলে আমাগো বিপদ হবে।

ক্রাসিমা কিছু বলল না, সে আগের মতো নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু তার চোখের ঢেউ মংতোর দৃষ্টি এড়াল না। মংতো সেই ঢেউ ছাপিয়ে পড়ার সুযোগ দিয়ে চলে এলো। উগড়ে ওঠা ব্যথা, ক্ষোভ, ভালোবাসা গলার কাছটায় দলা পাকিয়ে আটকে ছিল, সে একটা ঢোক গিলে সবকিছু আবার বুকে পাঠিয়ে দিল।

সকাল হতে হতে পাখির গুঞ্জনের সাথে সাথে মানুষেরও গুঞ্জন বাড়তে লাগল। মহিলারা একসাথে হয়ে কলকাকলিতে মেতে উঠল, গল্পের রসদ পেয়ে তাদের আনন্দিতই মনে হলো। অনেক গল্প চাউর হলো, তার মধ্যে কিছু বিপদের শঙ্কাও মনে জন্মাল। তাতে কলকাকলির কোনো ক্ষতি হলো না। তারা অবাক হতে পছন্দ করে, ভয় পেতেও ভালোবাসে।

মংতোসহ বেশ কিছু পুরুষ চলে গিয়েছে মানিকের খোঁজে। বৈঠা হাতে একদল নদীর দিকে চলল। থুইনুপ্রু অনেক দিন পর তার মাচাং ঘরের বারান্দায় বসে আছে, তার মুখে হাসি নেই, কপালে ভাঁজ আছে। দু'দিন পর যে এমনিতে মুক্তি পেত সে নিজের প্রাণ শঙ্কায় ফেলে কেন পালিয়ে গেল? মানিককে কখনোই তার এত বোকা মনে হয়নি। চিন্তা করতে করতে তার কপালের ভাঁজ আরো গভীর হলো।

খায়াচিং দাঁড়িয়ে আছে থুইনুপ্রুর পেছনে, থুইনুপ্রুর দেখাশুনা করার জন্য তাকে থাকতে হয়েছে। গ্রামের পাহাড়ি রাস্তায় বৈঠা হাতে পুরুষরা হারিয়ে গেল এইমাত্র, তবুও সে ঠায় তাকিয়ে আছে সেদিকে। তার ইচ্ছা ছিল যাওয়ার, আসলে ইচ্ছার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। ডাক্তার বাবুকে তার প্রয়োজন, সে দেখেছে কয়েক দিনের মধ্যে থুইনুপ্রুর নষ্ট পা-টা কীভাবে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। নিজের বিদ্যার উপর এখন আর অত বিশ্বাস নেই তার, যতটা ডাক্তার বাবুর সুঁইয়ে আছে। উথাইকে নিশ্চয়ই সারাতে পারত ডাক্তার বাবু। উথাইয়ের চোখে অচেনা দৃষ্টি সরিয়ে আগের উথাইকে ফিরিয়ে দিতে পারত। উথাইয়ের কোলে বাচ্চাটা না দিয়ে সে নিজে নিয়ে আংসাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল। তারপর থেকে উথাইয়ের চোখে তার জন্য ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি সে। সেদিন থেকে একবারও উথাই কাঁদেনি। ডাক্তার বাবুর কাছে নিশ্চয়ই কোনো ওষুধ আছে উথাইয়ের চোখে জল আনার।

উমের চোখের জলও শুকিয়ে গেছে। সকালবেলা নিজ ঘরে বসেই খবরটা পেয়ে গেল সে। সে ভুল করেছে, তার চোখের জল, ভরসা ভগবানের চরণে নিবেদন না করে এক বাঙালি পুরুষের চরণে করেছিল। তার চোখের জল এত মূল্যহীন ছিল না।

শেষ রাতে ভোরের আলো ফোটার আগেই বের হয়েছিল মানিক। সাথে দেড় লিটার পানি, আগুন ধরানোর জন্য একটা দিয়াশলাইয়ের বাক্স, মাচাং ঘরের নিচে পড়ে থাকা বেশ কিছু চুপড়ি আলু একটা পলিথিনের বড় ঝিল্লিতে বেঁধে নিল। কাজাচাই-এর ছুরিটা নিতে তার বেশি বেগ পেতে হয়নি। গহিন জঙ্গলে অজানা পথে যাত্রা, মানিকের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো না। মায়া হলো, এই গ্রামটার জন্য, এখানকার মানুষগুলোর জন্য, সন্ধ্যার গল্পের আসরের জন্য যার অংশ সে কখনোই ছিল না। এতো মায়ার খবর এই মানুষগুলো জানবে না, হয়তো বাঙালিদের ঘৃনা করার জন্য নতুন উপলক্ষ পাবে।

সে ঠিক করেছে উত্তর-পূর্ব দিক ধরে হাঁটবে, তাহলেই নদী পেয়ে যাবে। হয়তো এক দিনের বেশি লাগবে, তবুও সাথে বেশ কিছু আলু নিয়ে নিয়েছিল। তাতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হলো, পুঁটলিটা বেশ ভারী হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারেই সে হাঁপিয়ে

উঠেছিল, তবুও থামেনি। ঝোপঝাড়ের বাধা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সূর্য ওঠার পরেই বিপত্তি শুরু হলো, তার সব শক্তি যেন সূর্যটা শুষে নিচ্ছিল। দুটো পাহাড় ডিঙ্গাবার পরে দেহে আর শক্তি অবশিষ্ট রইল না, দুপুরবেলায় সূর্যটা দেখে রীতিমতো ভয় পেল সে।

জঙ্গলে একটা বড় সেগুন গাছ পেয়ে গেল, সেটার নিচেই বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়ল। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছে সে নিজেও জানে না।

মানিক দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের উপর, অনেকগুলো মানুষ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ঘিরে রেখেছে কিছু উর্দি পরা লোক। তাদের হাতে ভারী অস্ত্র। মানিক সবকিছু অস্পষ্ট দেখছে, শুধু ক্রাসিমাকে ছাড়া, ক্রাসিমাকে সে স্পষ্ট দেখতে পারছে। ক্রাসিমার হাত দুটো বাঁধা, তার শরীর রক্তাক্ত, চুল এলোমেলো। দুটো বেয়নেটসহ বন্দুক তার দুই দিকে তাক করা। হঠাৎ বরকত আলীকে দেখা গেল, মানিক অবাক হয়ে দেখল বরকত আলীর মুখে একটা হিংস্র, জঘন্য, লোভী হাসি। সে ক্রাসিমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ক্রাসিমা পিছিয়ে যাচ্ছে ভয়ে। মানিক চিৎকার করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না, তার গলা দিয়ে শুধু একটাই শব্দ বেরুচ্ছে, মা। বুক পকেটে হাত দিল সে, চিঠিটি নেই।

ধড়ফড় করে উঠল মানিক। স্বপ্নের ভয়াবহতায় নাকি রোদ্রের তীব্রতায় তার সারা শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখল, চিঠিটি চুপচাপ শুয়ে আছে তার বুকে। খুব তেষ্টা পেয়েছে। কেরোসিনের গ্যালোনে এক গ্যালোন পানি নিয়ে এসেছিল সে, সেই পানি মুখে দিলেই কেরোসিনের গন্ধে বমি আসে। কিন্তু এখন ঢকঢক করে বেশ কিছু পানি খেয়ে নিল। নিজেকে শান্ত করে স্বপ্নটা ভুলে যেতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, বারবার ক্রাসিমার রক্তমাখা ভয়ার্ত মুখটা মনে পড়ছিল।

রোদের তেজ তখনো কমেনি। আগুন জ্বালানোর জন্য শুকনো কাঠের অভাব নেই আশেপাশে, অনভিজ্ঞ মানিক প্রথমেই কাঠে আগুন ধরাতে গিয়ে পাঁচটা কাঠি নষ্ট করে ফেলল। তারপর কিছু শুকনো পাতা কুড়িয়ে এনে সেগুলোতে আগুন ধরাল, ধোঁয়ার মধ্যেই সাপের জিহ্বার মতো লকলকে একটা আগুনের শিখা দেখতে পেল। ধোঁয়াগুলো চোখে গিয়ে বেশ জ্বালা ধরিয়ে একেবারে কাঁদিয়ে ছাড়ল। এবার আগুনে ধীরে ধীরে শুকনো ডালপালা ঠেলে দিল মানিক। ষোল বছরের কিশোরের মতো আগুনটা বেশ উসকে উঠল।

মানিক আগুনের মাঝখানে দু-তিনটা আলু ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ জ্বালানি না পেয়ে আগুনটা ধীরে ধীরে কয়লার মধ্যে হারিয়ে গেল। ইতিমধ্যে মানিক গরমে আর আলুগুলো কয়লার আগুনে সেদ্ধ হয়ে গেছে। সে সেদ্ধ আলুগুলো কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে নিয়ে আসল, ক্ষিদে তেমন নেই কিন্তু তবুও খাওয়া দরকার। কোনোমতে একটা আলু খেতে পারল, বাকিগুলো পুটলিতে ভরে নিল। আরো এক টোক পানি গলায় ঢেলে দিল। কেরোসিনের বিশ্রী গন্ধটা নাকে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল। তার কাছে ঘড়ি নেই কিন্তু সূর্যের অবস্থান দেখে বলা যায় তিনটার কাছাকাছি বাজে। পুটলিটা কাঁধে নিয়ে আবার শুরু করল হাঁটা।

পাহাড়গুলো দেখতে যত বিশাল মনে হয়, চড়তে গেলে আরো বিশাল হয়ে যায়। পাহাড়ের পাদদেশে কত সুন্দর ফুল ফুটে থাকে, কত অদ্ভুত গাছ দেখা যায়, কত পাখি যে নানা ভঙ্গিমায় ডেকে যায়। কিন্তু মানিকের মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হবে ধীর লয়ে বয়ে চলা সাঙ্গু নদী, তার কলকল শব্দই সবচেয়ে সুন্দর সুর মনে হবে। পানির শীতল স্পর্শ গা জুড়িয়ে দেয়া দখিনা বাতাসের চেয়েও বেশি শিহরণ দিবে।

সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মানিক আবার বসে পড়ল, তার পাগুলো বাচ্চা মেয়েদের মতো অভিমান করে যেন ফুলে আছে। পলিথিনের ঝিল্লিটা খুলে বিছিয়ে দিল ঘাসের উপর। তারপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই সেদ্ধ আরো একটা আলু খেল। এখানেই রাত কাটাবে ঠিক করল সে। আগুন জ্বালানো দরকার কিন্তু বিন্দু পরিমাণ শক্তি অবশিষ্ট নেই। রাতে কত জন্তু-জানোয়ার এসে তাকে খাবার মনে করতে পারে, সাপেরা এসে তার বুড়ো আঙুলকে ইঁদুর মনে করে কামড়ে দিতে পারে। নিজেই নিজেকে মনে করিয়ে দিল। কিন্তু অবসন্ন শরীর পাত্তাই দিল না। চোখ বুজে আসল।

চিত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে মানিক। শিমুল তুলার তোষকেও এত ভালো ঘুম আসে না তার। আজ সে ঘাসের বিছানায় শিশুদের মতো ঘুমাচ্ছে। বাতাসের কারণে মশারা সুবিধা করতে পারছে না, কামড় বসানোর আগেই পাখা ভেঙে পড়ে যাচ্ছে।

গলার কাছটায় শীতল একটা স্পর্শ ঘুমের মধ্যেই অনুভব করল মানিক, নিতান্ত অনিচ্ছায় চোখ মেলল। চোখ মেলেই চোখটা বড় হয়ে গেল, একটা কালো রঙের মোটা সাপ তার গলার উপর দিয়ে হিস হিস করে চলে যাচ্ছে। হালকা আলোতেই তার চামড়ার কালো আঁশগুলো চকচক করছে। চিৎকার করতে গিয়েও করল না, চুপ করে নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে। নিঃশ্বাস ছাড়লে হয়তো তা চিরতরে আটকে যাবে। জঙ্গলে থাকতে হলে জঙ্গলকে শ্রদ্ধা করতে হয়, জঙ্গলে যারা থাকে তাদেরও শ্রদ্ধা করতে হয়, পাহাড়িরা তাই করে, প্রকৃতিও তাদের দু' হাত ভরে দেয়। মানিকও কালো সাপটাকে আর ঘাঁটাল না, সেটা শ্রদ্ধায় অথবা ভয়ে অসাড় হয়ে। সাপটা চলে যেতেই মানিক তড়িঘড়ি করে উঠে বসল। এজন্যই পাহাড়িরা বলে জঙ্গলে নাকি এক চোখ খোলা রেখে ঘুমাতে হয়। মানিক এক চোখ খোলা রেখে ঘুমাতে পারে না, সে দু' চোখই খুলে রাখল, আর ঘুম আসছে না তার। কিছুক্ষণ পর পর পাতার খস খস শব্দে এদিক-সেদিক ফিরে তাকায়, কী যেন আছে চারপাশে, আবার শুয়ে পড়ে। মানিক মনে মনে ভেবে আশ্চর্যিত হয়, ঘনবসতির ঢাকা শহরে সে নিজেকে একা অনুভব করত। আর এই জনমানবহীন পাহাড়ি জঙ্গলে মনে হচ্ছে সে একা নয়।

পাতার ফাঁকে সূর্যটা উঁকি দিতেই মানিক উঠে পড়ল। আগুন জ্বালিয়ে দু-তিনটি আলু পুড়িয়ে, বাকিগুলো ফেলে দিল। আর এক দিনের বেশি লাগবে না পৌঁছাতে, তাছাড়া বনে অনেক ফলের গাছও আছে। এত ওজন নিয়ে হাঁটার কোনো মানে হয় না। ওজন কমানোর পরও এগুনো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, পাহাড়গুলোর উচ্চতা যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজের বাঙালি ফুসফুসের দুর্বলতা টের পেল মানিক। পানির গ্যালনটা অনেক

হালকা হয়ে গেছে, কতটুকু পানি অবশিষ্ট আছে তা দেখার সাহস হচ্ছে না। নিজের শরীরের অক্ষমতাকে অস্বীকার করে চলতে থাকল মানিক। কিন্তু দুপুর হতে হতেই সে বুঝল, দিনের বেলায় হাঁটলে পানির পিপাসায়ই সে মারা যাবে। তাই ঠিক করল, সোজা পথ ধরে রাতের বেলা হাঁটবে। রাতের বেলা চোখ বুজাও বিপদ, কত নিশাচর প্রাণী শিকারের সন্ধানে বের হয়। দিনে ঘুমালে দু' চোখ বন্ধ করেই ঘুমাতে পারবে।

বিকাল পর্যন্ত পাহাড়ের কোলে শুয়েই কাটাল মানিক। পায়ের ফুলো ভাবটা এখনো কমেনি। শরীর ধীরে ধীরে হাল ছেড়ে দিয়েছে, একটু বিশ্রামে আলস্য ভর করে। তখনি তার চোখে ভেসে ওঠে নাভি না কাটা পানিতে ভেসে যাওয়া শিশুর লাশ। তার মাতামহের নরকের ভয় না থাকলে সেও হতে পারত সেই লাশটা। কোনো নালায় পড়ে থাকত, পঞ্চাশ পয়সার পলিথিনের ব্যাগে।

চোয়াল শক্ত করে আবার হাঁটতে থাকে মানিক। প্রথম কয়েক পা দিতেই মনে হলো পায়ে যেন কেউ হাজারটা সুচ ফুটিয়ে দিল, কিন্তু সে থামল না। সব ব্যথা অগ্রাহ্য করে শামুকের মতো বসে থাকা ঝোপঝাড়ের নিদ্রাভঙ্গ করে হাঁটতে লাগল। জঙ্গল রাতে জাগে, মানিকও এখন জঙ্গলের অংশ, সেও রাত জেগে হেঁটে চলেছে। কিন্তু সে জানে না এই জঙ্গল যত মমতাময়ী ততটাই নিষ্ঠুর এবং ছলনাময়ী। হাঁটতে হাঁটতে কখন পথ ভুলে, ভুল পথে যাচ্ছে তা সে বুঝতে পারল না। দুই বেলা পিটি করা মিলিটারিও এই বন-জঙ্গল পাড়ি দেয়ার সাহস করে না, আর এক ডাক্তারের এই আস্পর্ধা জঙ্গল মানবে কেন।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ভীষণ ক্রোধে কী যেন ছুটে আসছে মানিকের দিকে। নতুন গুল্মের ঈষৎ শক্ত কাণ্ডগুলোকে নির্দয়ের মতো ভেঙে-চুরে এগিয়ে আসছে। মানিক কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রায় আশি কিলোগ্রামের একটা শরীর তার উপর আছড়ে পড়ল। একটা বন্য শূকর, দূর থেকে দেখতে কত নিরীহ মনে হয়। বনে অনধিকার প্রবেশের জন্যই বুঝি মানিকের উপর তার এই ক্ষোভ, মানিক কিছু বুঝে ওঠার আগেই শূকরটি তার ধারালো দাঁত বসিয়ে দিল পায়ে। অসহ্য যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল মানিক, পাটাকে সর্বশক্তি দিয়ে ঝেড়ে দিল। তাতেও শূকরটি পা ছাড়ল না, মানিক কোমড়ে হাত দিয়ে কাজাচাই এর ছুরিটি পেয়ে গেল, হাতে নিয়ে একেবারেই নীরিহভাবে শূকরটির গায়ে খোঁচা দিল। এবার বোধ হয় কিছু শ্রদ্ধা জাগলো শূকরটির, কুঁই কুঁই করে দৌড়ে ঝোপঝাড়ে হারিয়ে গেল। পায়ের কাছে উষ্ণতা অনুভব করল মানিক।

তাকিয়ে বুঝল রক্ত ঝরছে, বন্ধ করা দরকার, দুই হাতে চেপে ধরেও রক্ত বন্ধ করা গেল না। মানিক খায়াচিং-এর বিদ্যা কাজে লাগাতে চাইল, বেল গাছের কচি পাতা পাঁচ মিনিটের মধ্যে রক্ত বন্ধ করতে পারে। পলিথিনটি একটু ছিঁড়ে পায়ে বেঁধে বেল গাছের খোঁজে হাঁটতে লাগল সে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, হঠাৎ করেই যেন সব বেল গাছ উধাও হয়ে গেল, কাল পর্যন্ত কত বেল গাছ পেরিয়ে এসেছে সে, আজ একটাও পাচ্ছে না। রক্ত ঝরেই যাচ্ছে, আর কোনো উপায় না খুঁজে পেয়ে মানিক পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করল, মাংসপেশি পুড়িয়ে রক্ত বন্ধ করতে হবে। দিয়াশলাইটা জ্বালিয়ে ক্ষতটার কাছে নিয়ে ধরল, পায়ের পশম পোড়ার গন্ধ আসল নাকে, সাথে একটু মাংস পোড়ার

গন্ধও। তারপর শুরু হলো অবর্ণনীয় যন্ত্রণা। মানিক নিঃশ্বাস আটকে চোখ বন্ধ করে যন্ত্রণাটা সহ্য করল। যন্ত্রণাটা একটু কমে গেলেও প্রচণ্ড জ্বালা রয়ে গেল তবে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

এক মুহূর্তের জন্যও মানিক হারেনি, সে হারতে পারে না কারণ এখনো অনেক কিছু দেখার বাকি তার, উমের ফুটফুটে বাচ্চাটাকে একবার হলেও কোলে নিতে চায় সে, মৃত্যুর আগে একবার হলেও মাথায় মায়ের হাতের স্পর্শ চায়। দরকার হলে এক পায়ে জঙ্গল পেরুবে সে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল মানিক। সময়জ্ঞান নেই তার, কতক্ষণ হাঁটছে, কয়টা পাহাড় পাড়ি দিয়েছে বলতে পারে না। শুধু চন্দ্রাহত মানুষের মতো হাঁটছে। পিপাসার কথা ভুলে গেছে, মনে পড়লে বুঝতে পারত প্রায় এক দিন সে পানি খায়নি। বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেল, জ্ঞানহীন শরীর আর সইতে পারল না, শুকনো ডালের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মানিক দেখল, আবছা আলোতে দৈত্যের মতো দাঁড়ানো একটা কালো পাহাড়, ধীরে ধীরে পাহাড়টা আরো কালো আর ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। মানিকের মনে হলো সে মারা যাচ্ছে, মনে মনে আফসোস হলো বড় অসময়ে মারা যাচ্ছে সে।

শাসনের পর ঘুমন্ত শিশুকে যেভাবে আদর করে মা, সেভাবে গতকালের নিষ্ঠুরতার পর জঙ্গল যেন একটু বেশিই কোমল হলো মানিকের প্রতি। শিশির মাখা ঘাসের ডগা মানিকের ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে দিল। তার কানের কাছে নাম-না-জানা একটা পাখি ঘাসের মধ্যে চঞ্চু ডুবিয়ে খাবার খুঁজছে। মানিককে মৃত ভেবে তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়নি পাখিটি, খাবারের খোঁজে মানিকের কানের ভেতর চঞ্চু ডুবিয়ে দিল, তাতেই মানিক জেগে উঠল। রাতে অসাড় হয়ে পড়া শরীরটি বিশ্রামের কারণে কিছু শক্তি ফিরে পেয়েছে। ধীরে ধীরে হাত-পায়ে অনুভূতি ফিরে পেল সে, রক্ত প্রবাহ টের পেল শরীরের ভেতর। চোখ খুলে দেখল সব যেন রং হারিয়েছে, গাছপালা, পাহাড়, আকাশ, পাশে একমনে খাবার খুঁজে যাওয়া পাখিটি সব রংহীন, ফ্যাকাসে। রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক হওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে আবার রং ফিরে পাচ্ছিল সব। পাখিটির পালক লাল তাতে ছোপ ছোপ কালো, ঠোঁটটি হলদেটে। পাশে নাম-না-জানা একটি গাছ, তাতে লাল দেখতে খুব সুন্দর ফল ধরেছে। ঘাসগুলো একেবারে সজীব, বাতাসটাও সতেজ। জোরে শ্বাস নিল সে, ফুসফুসে বেশ কিছু সজীব শীতল বাতাস হুড়মুড় ঢুকে পড়ল। মানিক এক পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সামনের দিকে তাকিয়ে উত্তেজনায় কিংবা শরীরের দুর্বলতায় মানিকের শরীরটি কাঁপতে লাগল। যা দেখছে তা সত্যি হতে পারে না, নিজের চৈতন্যে সন্দেহ হলো তার। সামনে একটি পাহাড়, তার চূড়ায় বিশালাকার কৃষ্ণচূড়া ডালপালা মেলে চূড়াটি প্রায় ঢেকে ফেলেছে, কিন্তু অবিশ্বাসের অংশটুকু হলো, পাহাড়টার রং নীল আর উত্তেজনার অংশটুকু হলো, মানিক এই দৃশ্য আগেও দেখেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিলাসবহুল মাচাং ঘরে এই নীল পাহাড় সে দেখেছিল। সেটা দেখতে হুবহু এ রকম ছিল কিন্তু এত বিশাল ছিল না, পঁয়তাল্লিশ বাই ত্রিশ সেন্টিমিটারের ক্যানভাসে শফিক সাহেবের স্টুডিওতে দেখেছিল সে, নীল পাহাড়।

শরীরে অনুভূতি ফেরার সাথে সাথে ক্ষুদা-পিপাসার অনুভূতিও ফিরে এলো। লাল কিছু ফল তার পায়ের কাছেই পড়ে রয়েছে। খেতে গিয়েও খেল না। পাখিটি এত ফল থাকার পরেও মাটিতে খাবার খুঁজছে। বনে, পাহাড়ে না জেনে কোনো ফল খাওয়া উচিত নয়, আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফলটা সবচেয়ে বিষাক্ত হয়। মানিক নিজেকে সংবরণ করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল নীল পাহাড়ের দিকে। পাহাড়টিকে দেখতেও খুব আকর্ষণীয় লাগছে, যেন তাকে ডাকছে। মানিক জানে না সেখানে কত বিষ লুকিয়ে আছে।

অতি কষ্টে পা-টাকে আরো যন্ত্রণা দিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক হেঁটে নীল পাহাড়ের চূড়ায় এসে উপস্থিত হলো। শফিক সাহেব যে রহস্য সেদিন ভাঙেনি আজ মানিক তা উদ্ধার করল। পুরো পাহাড় ক্রাসিমার খোঁপায় গোঁজা নীলাভা ফুলে ছেয়ে আছে। কিন্তু নীল পাহাড়ের রহস্য এত সামান্য নয়। এই পাহাড়ের কোলেই বিস্তৃত মাঠে ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের কলঙ্ক। আড়াই ফুট উচ্চতার পপি গাছগুলো নিরীহভাবে হাসছে এই সমতলভূমিতে। এই ফসল শিশুর ক্ষুধা মেটাবার জন্য নয়, মাচাং ঘরে মজুদ করার জন্যও নয়। এই ফসল লোভের, পাপের। যে পাহাড় মায়ের মতো আগলে রাখে তার কোলেই চাষ হচ্ছে বিষের। এই একা পাহাড়টি যেন তার নীরব সাক্ষী। দুঃখে, কষ্টে, কলঙ্কে যেন পাহাড়টি নীল হয়ে আছে।

বিশাল সমতল ভূমির ঐ প্রান্তে ছোট ছোট কিছু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। এক পাশে বেশ কিছু কুঁড়েঘর। ক্ষেতের চারপাশে কিছু লোক ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে, তাদের নজর পাহাড়ের দিকে। তাদের ঘাড়ে বন্দুক আছে, পাখিমারা এয়ার গান নয়, রীতিমতো রাইফেল।

মানিক অবাক হলো, বন্দুক দেখে নয়, তাদের শার্টের বোতাম লাগানো দেখে। একজন তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, তার দিকে বন্দুক তাক করে কী যেন বলতে লাগল, তা বুঝার সাধ্য মানিকের নেই। ভাষাটা মারমার কাছাকাছি হলেও উচ্চারণটা একেবারে ভিন্ন।

আরো দুজন এগিয়ে এলো, তারাও বন্দুক উঁচিয়ে রেখেছে। মানিককে ধরে নামাল দুজন, নয়তো নিজে নিজে নামার শক্তি তার ছিল না। দুইজনের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল, একজন হঠাৎ করে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মানিকের মাথায় আঘাত করল। তারা হয়তো বন্দুকের ব্যবহার খুব একটা করতে পারে না তাই সুযোগ পেয়ে একটু বাঁটটাই ব্যবহার করে নিল। মানিকের মাথার পেছনে চামড়া কেটে রক্ত বের হতে লাগল, মানিককে ধরে থাকা দুজন খুব বিরক্ত হলো, চেঁচিয়ে কী যেন বলল পেছনের জনকে। মানিকের শরীরটা এলিয়ে পড়ল, তারপর দুজন মানিককে ঝুলিয়ে একটা কুঁড়েঘরে নিয়ে এলো। কেউ একজন পানি এনে দিল একটা জগে। মানিক নিমিষেই এক জগ পানি খেয়ে ফেলল তবুও পিপাসা মেটেনি। তাকে একা রেখে ঘরটা বাহির থেকে বন্ধ করে সবাই চলে গেল। মানিক বুঝল, সে দ্বিতীয় বারের মতো বন্দি হলো, প্রথমবারের মতো বন্দুকের নলের মুখে। কিছুক্ষণ পর বুঝল সে একই পক্ষের দ্বারা

দুইবার বন্দি হলো যখন সে আংসাইকে দেখল। আংসাইয়ের চেহারায় প্রথমে বিস্ময় ফুটে উঠল—

তারপর চোখে কুটিল এবং হিংস্র একটা দৃষ্টি দেখা গেল। সে মানিকের কাছে এসে বলল—

আমি যত শিকার করছি তার মইধ্যে বাঙালি শিকার করতে হুবছে ভালো লাগে।

মানিক শান্তভাবে বলল—

এই তোমাদের দক্ষিণের পাহাড়ের চাষবাস? এই লোকগুলো কি মায়ানমারের?

আংসাই কিছু বলল না, তার মুখে সেই কুটিল হাসিটি ধরে রেখেছে সে। সে তার ছুরিটি বের করল, চকচকে ছুরিটি অকারণেই মানিকের সামনে নাড়াতে লাগল। শিকার ভয় না পেলে শিকারে মজা নেই।

এমন সময় বন্দুক কাঁধে একজন ঢুকল, সে আংসাইকে ধমক দিয়ে বাহিরে নিয়ে গেল। বন্দুকওয়ালাকে আংসাইয়ের তুলনায় আকারে ক্ষুদ্রই বলা যায়, একেবারে শুকনো, চিমসানো শরীর। তারপরও ধমক দিতে একটুও গলা কাঁপল না, তার কাঁধে যে বন্দুক আছে। আংসাইও বন্দুকের ক্ষমতা মেনে চলে। সে মাথা নিচু করে বাহিরে চলে গেল। তারপর সারাদিন আর কারো দেখা নেই। অনেক শলা-পরামর্শ হলো মানিকের ভাগ্য নিয়ে, সন্ধ্যায় চারজন লোক একটি দড়ির দোলনা এনে তাকে বসিয়ে দিল, বাঁশ দিয়ে চারজন মিলে বয়ে নিয়ে চলল তাকে। এরকম দোলনার পালকিতে আগেও চড়েছে মানিক। রাত্রির অন্ধকারে কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছাড়াই তারা চলতে লাগল উত্তর দিকে। রাত্রির সব সৌন্দর্য অপচয় করে, জোনাকি পোকাগুলোকে অবহেলা করে মানিক চোখ বুজল।

থুইনুপ্রুর ঘরে অনেক মানুষ থাকার পরও কেমন যেন নীরবতা ভর করেছে। আংসাই এক কোণে বসে আছে মেঝেতে। দড়ির পালকির একটা কোনা তার ঘাড়েই ছিল সারারাত, তার চোখে-মুখে ক্লান্তি। মংতো, খায়াচিং আরো কিছু বয়োবৃদ্ধও ঘরে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। থুইনুপ্রু বিছানায় আধশোয়া। বিছানার সামনে একটি চেয়ারে মানিক বসে আছে। তার চোখে কোনো অনুতাপ নেই। ঘরের বাহিরে বারান্দায় কৌতূহলী মহিলারা কাজ ছেড়ে ভিড় করেছে, তারা জানালা, দরজা ধরে উঁকিঝুঁকি মারছে। যা একটু ফিসফাস শব্দ হচ্ছে সব তারাই করছে। ছোট গ্যাদা বাচ্চাদের মায়েরাও এসেছে, তাদের ব্যাপক কৌতূহল থাকলেও তাদের বাচ্চাদের বিন্দুমাত্র নেই, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে। বুকের কাপড় তুলে স্তন মুখে পুরে তাদের শান্ত রাখতে হচ্ছে।

মহিলাদের ঠেলে ঘরে ঢুকল ক্রাসিমা, দৌড়ে এসেছে, একটু হাঁপাচ্ছে। মানিকের ছিন্ন বস্ত্র আর জীর্ণ মুখ দেখে চোখের জল আটকাতে পারল না সে। মুখে হাত দিয়ে নীরবে কাঁদছে, যদিও এই কান্না কারো নজর এড়াল না। মংতোর মনে ভীষণভাবে জ্বলতে থাকল প্রতিটা অশ্রু। মানিক শূন্য দৃষ্টিতে শুধু একবার ক্রাসিমার দিকে তাকাল।

থুইনুপ্রু সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল—

ডাক্তার বাবু, আপনাকে তো বুদ্ধিমান ভাবতাম, আপনি এই ভুল কেন করলেন?

মানিক শান্ত স্বরে বলল—

আপনি কেন করলেন?

মানে?

আপনাকে হিংস্র, নির্দয় মনে হতো কিন্তু সৎ ভাবতাম। আপনি এই ছলনা কেন করলেন? আপনি পাহাড়িদের দিয়ে পপি চাষ করাচ্ছেন, মায়ানমারের লোকদের সাথে মিলে।

থুইনুপ্রুর চেহারায় বিচলতা দেখা দিল, হাতের সিগারেটটি ফেলে দিয়ে হিংস্রভাবে তাকাল মানিকের দিকে। মানিককে সম্মান দিয়ে 'আপনি' সম্বোধন না করে 'তুমি'তে নেমে এলো। বলল—

তুমি সেদিন আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, এত লোকের খরচ কোথা থেকে আসে? তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ। অর্থই হলো শক্তি, সে শক্তি ছাড়া আমরা বাঙালিদের সাথে টিকতে পারব না। ছলনার কিছু নেই, সবাই তা জানে।

আপনি আবারও ছলনা করছেন, আপনি সংগঠনের জন্য পপি চাষ করেন না, আপনি পপি চাষ করার জন্য সংগঠন করেছেন। কেউ কি জানে এই পপি চাষে একজন বাঙালিও জড়িত? বরঞ্চ আমার মনে হয় আপনি তার হয়েই কাজ করেন।

ঘরের মধ্যে এতক্ষণে একটা গুঞ্জন উঠল, কিন্তু কেউই মানিককে বিশ্বাস করল না, কেউ একজন বলে উঠল, 'ছালা বাঙালি'। ক্রাসিমা শুধু অবাক হয়ে শুনছে, পপি চাষের কথা সে জানত না। থুইনুপ্রু গলা উঁচু করে বলল—

কী যা-তা বলছ। তোমার হুঁশ নেই।

হুঁশ আমার ফিরে এসেছে। যেই নীল পাহাড়ের ধারে আপনারা এই বিষ চাষ করছেন সেই নীল পাহাড়ের ছবি শফিক সাহেব তার স্টুডিওতে এঁকেছেন, আমি নিজ চোখে দেখেছি। তার তো এই পাহাড় দেখার কথা না।

উনি ছবি আঁকলেই কি প্রমাণ হয়ে যায় যে উনার সাথে আমার যোগাযোগ আছে?

না, তবে আপনার ঘরে যখন তার আঁকা ছবি ঝুলে তখন প্রমাণের কিছু বাকি থাকে না।

মানিক রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—

ছবির নিচে তার স্বাক্ষরও আছে।

সবাই সেদিকে তাকাল, যারা পড়তে পারে না তারাও। মানিক আবার বলতে লাগল—

তিনি একজন শিল্পপতি, শুনেছি তার টাকার নেশা ছিল। সব ছেড়ে উনি কেন এই পাহাড়ে একটা অকর্মা এনজিও নিয়ে পড়ে আছেন? একটা স্কুল দিয়েছিলেন তিনি, তাও জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে।

থুইনুপ্রু গম্ভীরভাবে বলল—

আমরা কারো স্কুল জ্বালাইনি।

-আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি নিজেই জ্বালিয়েছেন। পাহাড়ি বাঙালিদের উসকে দিয়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে। বরকত আলীর মতো লোক দিয়ে

পাহাড়িদের নিজেদের জমি থেকে বিতাড়িত করেছেন, আবার সময় হলে সে বরকত আলীকে মেরে ঘৃণাটা জিইয়ে রেখেছেন। আপনি বিতাড়িত পাহাড়িদের আশ্রয় দেয়ার নাম করে এখানে নিয়ে আসেন, তারা কৃতজ্ঞতার বসে আপনার জন্য সব করে, বিষও চাষ করে।

ঘরে নীরবতা ফিরে এলো, বাহিরেও ফিসফাস বন্ধ, দুধের বাচ্চারাও যেন কৌতূহলী হয়ে উঠল। মানিক আবার বলতে লাগল—

আপনি যদি পাহাড়িদের কল্যাণের জন্য কাজ করতেন, তবে তাদের ভূমিহীন করে এখানে এনে আশ্রয় দিতেন না। নিজের ভূমির জন্য লড়াই করা শেখাতেন। পাহাড়ি সংস্কৃতি রক্ষার নামে জুম চাষের ঐতিহ্য বাদ দিয়ে এদের দিয়ে পপি চাষ করাতেন না। এদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন, তাদের মূর্খ রেখে নিজের ফায়দা লুটতেন না। আপনার স্ত্রী মারা গেছে, আমার বিশ্বাস আপনার ছেলেমেয়ে আছে এবং তারা রেঙ্গুনে বিশাল বাড়িতে খুব আরাম-আয়েশে আছে। পাহাড়িদের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য তাদের জুমচাষও করতে হয় না, পপি চাষও করতে হয় না।

থুইনুপ্রু হুংকার দিয়ে উঠল, সমস্ত গ্রামটা যেন কেঁপে উঠল। সব সময় তাকে শান্ত দেখেছে সবাই, এমন ক্রোধ আগে কেউ দেখেনি। তার চোখ দুটি আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে। ফোঁসফোঁস করে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল। মংতোর দিকে তাকিয়ে বলল—

এই মিথ্যাবাদী কুকুরটাকে নিয়ে বেঁধে রাখো। আজ রাতে এর ব্যবস্থা করব।

তার আদেশ অস্বীকার করতে শিখেনি কেউ, আজও করল না। মংতো মানিককে ধরে বাহিরে নিয়ে গেল। থুইনুপ্রুর ক্রোধের ঘূর্ণিঝড়ের সামনে কেউ পড়তে চায় না, তারা ধীরে ধীরে সরে গেল। অনেকেই মনে মনে মেনে নিল, মানিক মিথ্যা বলেছে, থুইনুপ্রু যেহেতু বলেছে সেহেতু মানিক মিথ্যা বলেছে। কিন্তু ধানের কুটা পড়া চোখের মতো মনটা খচখচ করতে লাগল। সবাই বেরিয়ে গেল, ক্রাসিমা শুধু রবীন্দ্রনাথের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল, রবীন্দ্রনাথ মুচকি হাসছেন।

থুইনুপ্রুর কপালের পাশের শিরা দুটো দপ দপ করতে লাগল। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে, শিরাগুলো রক্ত সরবরাহ করে কূল পাচ্ছে না। আজ তার সব গাম্ভীর্য, সব অহংকার এই ডাক্তারটি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। সবাই হয়তো বিশ্বাস করেনি কিন্তু সে নিজে জানে সে একজনের সামনে নগ্ন হয়ে গেছে, নিজের কাছে। সে নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, পাহাড়িদের কল্যাণ করছে সে, আজ ডাক্তার তার নিজের আসল প্রতিবিম্ব দেখিয়ে দিল।

ঢাকায় গিয়ে জীবন গড়তে চেয়েছিল সে, কয়েকটা বছর নষ্ট করা ছাড়া কিছুই হয়নি। একমাত্র ব্যাপার যেটাকে সে ভালো বলতে পারে তা হলো, শফিক আহমেদের সাথে দেখা হওয়া। সন্ত লারমার সংহতিতে যোগ দিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছে, অস্ত্র চালনা শিখেছে। গহিন পাহাড়ে সমতলভূমি দেখে সেই-ই প্রস্তাব দেয় পপি চাষের। শফিক আহমেদের ব্যবসায়িক বুদ্ধি ভালো, সে লুফে নেয়। সব ছেড়ে পাহাড়ে আস্তানা গাড়ে। পাহাড়ে এমনিতে তখন বহু পাহাড়ি ভিটে ছেড়েছে, একটা যুদ্ধ চলছে পাহাড়ে।

যেখানে যুদ্ধ চলে শকুনেরা সেখানে চলে যায়, খুঁটে খুঁটে মাংস খায়, তারাও খেয়েছে। ভিটে ছাড়া পাহাড়িদের দিয়ে পপি চাষ করাত, সেগুলো পাচার হতো মিয়ানমারে। তারা সবগুলো জমি বাছাই করেছিল, সীমান্তের কাছে যাতে পরিবহনে সমস্যা না হয়। তাদের লোডও বেড়ে গেল, শফিক সাহেব একটা ভদ্র, দয়ালু মুখোশ পরে পাহাড়িদের উচ্ছেদ করত আর থুইনুপ্রু তাদের কাজে লাগিয়ে আরো জমি নিয়ে চাষবাস বাড়িয়ে দিল। সারাজীবন ব্যবসা করে যা আয় করেনি শফিক আহমেদের দুই বছরে তার চেয়ে বেশি আয় হলো।

থুইনুপ্রুও রেঙ্গুনে বাড়ি করেছে। দুই ছেলে পড়াশুনা করছে, বউ মারা যাবার পর কম যাওয়া হয় রেঙ্গুনে।

রবীন্দ্রনাথের ছবিটার দিকে তাকিয়ে মনটা আর্দ্র হয়ে গেল। তার বউ রবীন্দ্রসংগীত গাইত। পাহাড়ি মেয়ের রবীন্দ্রসংগীতে কীভাবে ঝোঁক হলো কেউ বলতে পারত না। খুব সহজেই রেডিওর শিল্পী হতে পারত সে। রেঙ্গুনের বাড়িতে শফিক সাহেব প্রায়ই যেতেন।

তখন তার বউ আবদার করেছিল, রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি এঁকে দেয়ার জন্য, ঘরের দেয়ালে বাঁধাই করে রাখবে। শফিক সাহেব এঁকে দিয়েছিলেন, কিন্তু তত দিনে টাইফয়েডে বউ মারা গিয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের এই ছবিটি সব সময় নিজের ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখে থুইনুপ্রু। যত খারাপ মানুষই হোক সে, বউকে বড় ভালোবাসত।

ডাক্তারের কথা মনে হতেই মনের আর্দ্র ভাবটা হারিয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিহিংসা ভর করল। এখন কিছু করা যাবে না, সবাইকে কথাগুলো ভুলতে একটু সময় দিতে হবে। আজ রাত অপেক্ষা করে কাল ভোর হওয়ার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবল সে তারপর মংতোকে ডেকে পাঠাল।

সারাটা দিন গ্রামে থমথমে ভাব ছিল, মেয়েরা গল্প করেছে, তাঁত বুনেছে, বুড়োরা হুঁকো টেনেছে, বাচ্চারা এটা-সেটা খেলেছে। পুরুষেরা ক্ষণিক বুড়োদের সাথে ক্ষণিক মেয়েদের সাথে যোগ দিয়েছে। সব কিছু আগের দিনের মতোই হয়েছে, তবুও কোথায় যেন একটা বিষণ্নতা বাবলা কাঁটার মতো বিঁধে রইল। ক্রাসিমা নিজের ঘর থেকে এক মুহূর্তের জন্য বের হয়নি, একবার ভেবেছিল মন্দিরে পুজো দিবে, প্রার্থনা করবে কিন্তু কার জন্য করবে ভেবে পায়নি। পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে সে, চোখেও কোনো চঞ্চলতা নেই।

শুধু মাঝে মাঝে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে ।

রাতটাও থমথমে ভাবে কেটে গেল, যারা ঘুমিয়েছে তারা জানে সকালবেলা গ্রামে পাঁঠা জবাই হবে। কিন্তু কারো মনে আনন্দ নেই, কেউ বুঝতেও পারছে না এমন লাগছে কেন।

অন্ধকার ঘরে হাত-পা বাঁধা মানিক মৃত্যুর অপেক্ষা করতে করতে তাঁর জীবনটা কল্পনা করে নিল। বাঁশের সিঁড়িতে পদধ্বনি শুনে মানিক চোখ বন্ধ করে রেখে প্রিয়জনদের মুখ মনে করার চেষ্টা করল, কিন্তু হায় কারো চেহারাই মনে ভাসল না। হন্তারকদের আক্রোশ ভরা কণ্ঠের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে। আংসাই এখনো ঘুমাচ্ছে, তার নাকডাকায় কোনো বিরতি নেই, ক্লান্তিহীনভাবে ডেকেই যাচ্ছে। তার জাগার সময় হয়েছে। কিন্তু যারা এলো তারা আংসাইকে জাগাল না।

ডাক্তার বাবু।

ক্রাসিমার গলা শুনে চমকে উঠল, চোখ খুলে আরো চমকে উঠল, ক্রাসিমার সাথে মংতো আর খায়াচিং। ক্রাসিমা বলল—

আমরা আপনাকে মারতে আসিনি, বাঁচাতেও আসিনি, আরো একটা উপকার চাইতে এসেছি। এর আগে আপনার উপকার চেয়েছি দাবি নিয়ে, এবার কোনো দাবি নেই।

মানিক হতবিহ্বল হয়ে বলল—

আমি মৃত্যুপথযাত্রী, আমি তোমাদের জন্য কী করতে পারি গলাটা বাড়িয়ে দেয়া ছাড়া?

আপনি জীবন বাঁচাতে পারেন, উমের সন্তান হচ্ছে, সে বোধহয় মারা যাচ্ছে।

আংসাইকে নির্বিঘ্নে ঘুমাতে দিয়ে তারা সবাই চলে এলো। মন্দিরের পেছনে একটা কুঁড়েঘরে প্রসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই গ্রামে এখানেই সব শিশু জন্ম নেয়। এখানে তিন দিন কাটিয়ে মায়েরা কোলে শিশু নিয়ে ঘরে ফেরে। সেই ঘরে ফেরা নিয়েও উৎসব হয়,

মন্দিরে পুজো দেয়া হয়, ঢাক বাজানো হয়। উমের কপালে সেই ঢাকের শব্দ নেই, তাকে বরণ করা হবে নিঃশব্দে ঝরা কিছু অশ্রু দিয়ে।

এখনো ভোর হতে কিছু সময় বাকি আছে। কিন্তু অনেকেই এই কুঁড়েঘরের সামনে উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে। তারা উমের জন্য উদ্বিগ্ন, তার সন্তানের জন্য নয়। মানিককে

দেখে একটা গুঞ্জন হলো, ফিসফাসও হলো। একজন মহিলা এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—

কপাল পোড়া মাইয়া, তারে বাঁচান। অবস্থা খুব খারাপ।

মানিক ভেতরে ঢুকে দেখল, হারিকেন জ্বালানো আছে, নিচে খড় পেতে বিছানা করা হয়েছে। উমে শুয়ে আছে আর হাঁপাচ্ছে। কিছু বৃদ্ধা উমের মাথার কাছে বসে আছে। মানিক প্রথমেই মাথায় হাত রাখল, প্রচণ্ড জ্বর। মানিকের হাতের স্পর্শেই উমে চোখ খুলল।

মানিককে দেখেই তার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, তারপর বলে উঠল—

আমার বাচ্চাটারে বাঁচান বাবু।

মধ্যরাত থেকেই প্রসব বেদনায় ভুগছে উমে। প্রচুর রক্ত ঝরেছে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। তবুও হাল ছাড়েনি। এখন মানিককে দেখে একটু স্বস্তি পেল সাথে সাথে অনুতপ্তও হলো। এই মানিককেই কাপুরুষ বলেছিল, আজ সে মানিক নিজের মৃত্যুকে সামনে রেখে তাকে বাঁচাতে এসেছে।

মানিক দেখল উমের অবস্থা আসলেই অনেক খারাপ, কোনো রকম ঔষধ ছাড়া তাকে বাঁচানো সম্ভব নয়। উমের দিকে একটু করুণায় তাকাল, উমে যেন সব বুঝে নিল, শ্বাস টেনে বলল—

দোহাই লাগে ডাক্তার বাবু, আমার জন্য চিন্তা করবেন না, আমার বাচ্চাটার যাতে কিছু না হয়।

মানিক শার্টের হাতা গুটিয়ে কাজে নেমে পড়ল। এরই মধ্যে উমে কয়েকবার মূর্ছা গিয়েছে। সকালের সূর্যের প্রথম কিরণ বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকার সাথে সাথেই নবজাতক শিশুর চিৎকার শোনা গেল। মানিক দুই হাতে শিশুটিকে জাপটে ধরে উমের কাছে এনে বলল—

তোমার ছেলে হয়েছে।

উমের মুখটা ক্লান্তিতে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, ঠোঁট দুটি নেড়ে দুর্বলভাবে একটু হাসল। রাজ্যের শান্তি নিয়ে সে চোখ বন্ধ করল সাথে নিঃশ্বাসও। তার সদ্য জন্মানো স্বল্পায়ু পুত্রকে অনাথ করে দিয়ে উমে মারা গেল।

যার প্রাণের জন্য সবাই প্রার্থনা করেছে সেই মরল আর যার প্রাণ কেউ চায়নি সেই বেঁচে রইল। তবুও মানিকের কোলে থাকা ফুটফুটে শিশুটিকে সবাই কাঁথা সরিয়ে দেখছে। কী সুন্দর হয়েছে দেখতে সাথেই সাথেই এই অনাথের জন্য মনে ব্যথা অনুভব করল সবাই। এই শিশুটিকে হত্যা করা হবে ভাবতেই বুক কেঁপে উঠল। কেউ না আবার মনে করিয়ে দেয় এই ভয়ে সবাই তটস্থ হয়ে রইল।

গম্ভীর সে মায়া ভরা সকালে এই শিশুটির ভাগ্যে কী হবে তাই নিয়ে মনে তোলপাড় হচ্ছিল সবার। ঠিক তখন গ্রামের মধ্য থেকে মেয়েলি গলায় একটা ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল। খায়াচিং আতঙ্কে বলে উঠল—

উথাই।

বলেই সে গ্রামের দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেল, তার পেছনে বাকি সবাই। মানিকও চলল, তার কোলে উমের ছেলে।

থুইনুপ্রুর মাচাং ঘরের সামনে জটলা লেগে আছে। কেউ কেউ কাঁদছে, সবাই ভেতরে ঢুকার চেষ্টা করছে কিন্তু মংতো কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। হাহাকার-আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। খায়াচিং বারান্দায় উথাইকে জড়িয়ে ধরে আছে, ক্রাসিমাও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখটা ভাবলেশহীন। মংতো মানিককে আটকাল না। মানিক ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখল, থুইনুপ্রু শুয়ে আছে, তার চোখগুলো স্থির, সেখানে বিস্ময় ফুটে আছে। তার বুকের বাম দিকে একটি ছোরা গেঁথে আছে, বুক থেকে একটা রক্তের ধারা বিছানা থেকে মেঝেতে নেমে এসেছে।

পাহাড়িরা খুব ক্ষমাপ্রবণ। উথাইকে শাস্তি দেয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারল না, কেউ এসে চোখ রাঙাল না, ধিক্কার, অভিশাপ দিল না। তাকে মহিলারা ঘিরে আছে। দূরে পুরুষেরা দাঁড়িয়ে শুধু আফসোস করছে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে।

উমে আর থুইনুপ্রুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রস্তুতি চলছে। মংতো সব দেখাশুনা করছে। সেই এখন তাদের নেতা, কাউকে বলে দিতে হয়নি সবাই মেনে নিয়েছে।

ক্রাসিমা এখনো ভাবলেশহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এতগুলো ঘটনা একসাথে মেনে নেয়া তার পক্ষে কঠিন। সে মানিককে দেখে এগিয়ে এলো, বলল—

উথাই যদি এই কাজটা না করত আমিই করতাম। একটা রাক্ষসকে দেবতা মেনে পূজা করেছি আমরা। আমাদের সরলতার সাথে কত বড় ছলনা করা হয়েছে।

মানিক ক্রাসিমার দিকে তাকিয়ে বলল—

শিক্ষার অভাব ছিল তাই পেরেছে, শিক্ষা না থাকলে আবার সুযোগ পেলে অন্য কেউ এদের ব্যবহার করবে।

একটু থেমে সে আবার বলল—

সবাই দেখি আমাদের দুজনের কথা ভুলে গেল, আমাদের আয়ু আর কতক্ষণ আছে?

আপনি ঠিকই বলেছিলেন, দেখেন সত্যি সত্যি একজন পাহাড়ির সন্তানকে নদীতে ভাসানোর কথা সবাই ভুলে গেছে।

আর আমাকে?

ক্রাসিমা চুপ করে গেল, মুখের মলিন হাসিটাও মিলিয়ে গেল।

"আপনারে ঠিকি সাঙ্গুত ভাসাইয়া দিবো, তয় নৌকায়" মংতোর কথা শুনে দুজনেই অবাক হয়ে গেল। মংতো কাছে এসে আবার বলল—

আপনের লগে আমাগো কোনো শত্রুতা নাই, আপনেরে কতা দিছিলাম ফিরাইয়া দিয়া আসুম। মংতো নিজের কতা রাকতে জানে।

ক্রাসিমা মংতোর দিকে তাকিয়ে বলল—

মংতোদা আমারও যাবার ব্যবস্থা করে দাও। আমিও চলে যাব।

মংতোর মুখে যেন মেঘ ভর করল। সে শুধু শান্তস্বরে বলল—

ঠিক আছে।

মানিকের কোলের বাচ্চাটা নিজের উপস্থিতি জানানোর জন্যই বোধহয় গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল। ক্রাসিমা মানিকের কোলের দিকে তাকিয়ে বলল,

উমের জন্য খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু তার বাচ্চাটার কী হবে? আমাকে দিন, আমি এই সন্তানকে পরিচয় দিব, বাঙালিও বানাব না, পাহাড়িও বানাব না। মানুষ বানাব।

মানিক কিছুক্ষণ বাচ্চাটাকে চুপ করানোর চেষ্টা করল, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল। ক্রাসিমার দিকে তাকিয়ে বলল—

তোমার চেয়ে ভালো আর কোনো 'মা' পাবে না উমের বাচ্চাটি। কিন্তু তার ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গেছে। তোমার চেয়ে অন্য কারো বেশি প্রয়োজন আছে তার।

মানিক বাচ্চাটাকে নিয়ে মহিলাদের দুর্গ ভেদ করে উথাইয়ের কাছে চলে এলো। উথাইয়ের দিকে বাচ্চাটাকে এগিয়ে দিয়ে বলল—

তোমার ছেলে।

উথাই বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ক্রন্দনরত বাচ্চাটাকে বুকের সাথে চেপে ধরে বলল—

আমার বু, আমার বু।

তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বহু দিনের জমানো অশ্রু। অলৌকিকভাবে বাচ্চাটার কান্না থেমে গেল। বৃদ্ধরা হাসিমুখে এই মা ছেলেকে আশীর্বাদ করতে লাগল। ক্রাসিমা ছুটে এলো মা ছেলের মিলন দেখতে। এই দৃশ্য দেখে খারাচিং নিজের কাঠিন্যের খোলস ভুলে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। সেও উথাইয়ের গলার সাথে সুর মিলিয়ে বলল—

আমার বু, আমার বু।

উমের সন্তানটি তার অনাথ জীবনের সমাপ্তি ঘটাল। সবাই ভুলে গেল বাঙালি ধর্ষকের বীর্যে হয়েছে এই সন্তান। উথাই ক্রাসিমার দিকে তাকিয়ে বলল—

দি, একটা নাম দেও আমার ছেলের।

ক্রাসিমা একবিন্দু চিন্তা না করে বলল—

তোমার ছেলের নাম মানিক। বড় ভাগ্যবান তোমার ছেলে, খুব মহান একজন মানুষের নাম পেয়েছে।

উথাই ছেলেটাকে আবার বুকে চেপে ধরল আর বলতে লাগল—

মানিক, আমার মানিক।

পৃথিবীর সব সম্মান যেন আজ মানিকের পায়ে অর্পণ করল ক্রাসিমা। আবেগে চোখ ভিজে উঠল মানিকের। সে চোখ মুছে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মংতোর দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে বলল—

শুধু কথা রাখার জন্যই এই কাজ করলে নাকি উমের সন্তানকে বাঁচাতে?

মংতো হকচকিয়ে বলল—

মানে?

মানিক বলল—

উথাই কখনো থুইনুপ্রুকে মারার সাহস করতে পারত না। যদি পারতও তবে থুইনুপ্রুর বুকে এলোমেলোভাবে দা দিয়ে কোপ দিত। কখনো ছুরি দিয়ে একেবারে হৃৎপিণ্ড বরাবর বসিয়ে দিত না। উথাইয়ের কাছে ছুরিও ছিল না, দা-টা তার পায়ের কাছেই দেখেছি আমি। আমরা কেউই থুইনুপ্রুর আর্তনাদ শুনিনি। ঘুমের ভেতর মুখ চেপে ধরে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়া হয়েছে, উথাই তা পারত না। উথাই এমনিতে দা নিয়ে দৌড়ে এসেছিল, প্রতিদিনের মতো। এই দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠেছে! বাকি সবাই মন্দিরের পেছনের ঘরের সামনে ছিল, শুধু তুমি ছিলে না। কেন করলে এ কাজ?

মংতো চোয়াল শক্ত করে দৃঢ় কণ্ঠে বলল—

আপনারে বাঁচানের জন্যি করি নাই, উমের ছেলের জন্যিও না। নিজেগো লাইগা করছি। লোভ ঢুকাইছেন তিনি পাহাড়িগো মইদ্যে, নিজেরও লোভ কম আছিল না। বাঙালিরা আমাগো ধ্বংস করতে পারবো কি না জানি না, লোভ আমাগো ঠিক শেষ করত। এই লোকগুলিরে শেষ হইতে দিতাম না আমি।

মানিক কিছু বলল না, তার মনটা শ্রদ্ধায় ভরে গেল এই স্বল্প শিক্ষিত পাহাড়ির জন্য।

ঢাকঢোল বাজিয়েই উমে গ্রামে ফিরল, সাথে কিছু অশ্রুও ছিল। তাকে বহন করা একটা কাঁধ মানিকেরও ছিল। ফুল দিয়ে ঢাকা তার নির্জীব দেহটি, চিতায় শোয়ানো হলো। আগুন জ্বলল চিতায়, আগুনের কুণ্ডলী ধোঁয়া হয়ে আকাশে মিলিয়ে যাবার আগেই মানিক আর ক্রাসিমা তাদের ফেরার যাত্রা শুরু করল।

কাজাচাই বৈঠা হাতে তাদের সাথে চলল। আরো দুজন সাথে গেল নদী পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। অনেক খুঁজেও মংতোকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ক্রাসিমাকে বিদায় দেয়ার সাহস তার নেই, হয়তো তার চোখ ভিজে উঠবে এই ভয়ে সে পালিয়ে ছিল। গ্রামের সবাই চিতা দুটো ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল, ক্রাসিমা আর মানিক অনাড়ম্বরভাবেই সবার অলক্ষ্যে বিদায় দিল গ্রামকে। আংসাই একটা জারুল গাছে ঠেস দিয়ে আক্ষেপের সাথে মানিককে দেখছে, তার শিকার এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ভাবতেই আফসোস হলো তার। কিন্তু মংতোর বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস তার নেই। সে-ই তার নেতা এখন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটতেই নদীর কলরব কানে আসল। মানিক খুব অবাক হয়ে গেল, এত কাছে ছিল নদীটি অথচ সে কত ভুল পথেই না হেঁটে গিয়েছে। তারপর ভাবল, মাঝে মাঝে ভুল পথও সঠিক গন্তব্যে নিয়ে যায়।

ছোট ডিঙিতে চড়ে বসল মানিক আর ক্রাসিমা। বৈঠা হাতে গলুইয়ের উপর বসল কাজাচাই। তার বৈঠা খুব একটা কাজে লাগছে না, স্রোতের টানেই ডিঙিটি হেলেদুলে চলতে লাগল। ক্রাসিমা মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল—

আপনি কোথায় যাবেন?

মায়ের কাছে যাব। তুমি?

আমাকে মানুষ পাহাড়ের মেয়ে বলে, আমিও আমার মায়ের কাছেই যাব। আমার নিজের ঘরে ফিরে যাব। পাহাড় ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। আমার বাবার মতো পাহাড়েই মরতে চাই আমি।

তারপর অনেক্ষণ নীরবতা, শুধু নৌকার পাটাতনে সাঙ্গুর আলতো ঠেস আর কলকল শব্দ শোনা গেল। তারা নীরবে বসে আছে, যেন এটা কোনো স্বপ্ন, কথা বললেই ভেঙে যাবে। কাজাচাইয়ের অবশ্য কোনো স্বপ্ন মনে হলো না, সে নিজের অক্ষমতার কারণেই নীরব। আকাশে অর্ধেক ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ উঠেছে। নৌকার মাঝি ছাড়া দুজন যাত্রীর একই স্মৃতি মনে পড়ে যায়, পাহাড়ে জোছনা বৃষ্টির স্মৃতি। ক্রাসিমা চাঁদের দিকে তাকিয়েই বলল—

মায়া লাগানো চাঁদ, সব ভাসিয়ে দেয় মায়াবী আলোয় আবার ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়।

আবার তো ফিরে আসে।

চাঁদ ফিরে আসে কিন্তু কিছু জোছনা আর কখনোই ফিরে আসে না।

মনের গভীরে কোথায় যেন হু হু করে উঠল দুজনের। সাঙ্গুর পেটে ভেসে চলল দুটি নীরব মানুষ, যাদের মনে উথাল-পাথাল ঢেউ, একজন বোবা মাঝি আর অর্ধেক চাঁদ।

ভোরবেলা থানচি ঘাটে ডিঙি ভেড়াল কাজাচাই। নদীর পাড়ে নৌকার গলুইয়ের ধাক্কায় স্বপ্নভঙ্গ হলো ক্রাসিমা আর মানিকের। রাতটা যেন খুব দ্রুত কেটে গেল। বিদায়ের সময় হয়েছে। কাজাচাই ডিঙিটি বেঁধে মানিকের পেছনে এসে দাঁড়াল। তার ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে সে মানিকের পিছু ছাড়ছে না। মানিক তাকে ইশারায় বলল, সে অনেক দূরে যাবে। কাজাচাইও ইশারায় বুঝাল, সেও যাবে। যদিও কাজাচাই কানে শোনে না, তবুও মানিক শব্দ করেই বলল—

সেই শহরে তুই টিকবি না রে। তুই পাহাড়েই থাক।

ক্রাসিমার দিকে ইশারা করে আবার বলল—

তোর দিদির সাথে যা, সে তোকে ফেলবে না।

বোবা কাজাচাই মানিকের চোখের ভাষা বুঝে নিল, সে ক্রাসিমার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। মানিক ক্রাসিমাকে কী বলবে ভেবে পায় না। দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ, অনেক কথা এসে আটকে গেছে ঠোঁটে, অনেক ভার জমেছে যেন তার পায়ে। ক্রাসিমা একটা কথাও বলেনি, মানিকের পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে তারপর উঠে মুখ ঘুরিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে যায়। পথের বাঁকে হারিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মানিক ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

একশ' ঢুলি মানিকের হৃৎপিণ্ডে বসে ঢাক বাজাচ্ছে। গত দশ মিনিট ধরে সে ঢাকা মেডিক্যালের মেডিসিন ওয়ার্ডের বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে। কত তাড়া করেছে, শত শত মাইল পাড়ি দিয়েছে, সারা জীবন অপেক্ষা করেছে, প্রার্থনা করেছে এই মুহূর্তের জন্য। আজ সেই মুহূর্ত আর কয়েক কদম দূরে, অথচ পা আর চলছে না। সে কি সইতে পারবে এ সুখ, বুক ফেটে কি সে মারা যাবে না? সে মরণও ভাগ্যের মরণ। মানিক পা বাড়াল ভেতরে, এগারো নম্বর বেড তার গন্তব্য। দুই তিন চার নম্বর পার করেছে, মনে হচ্ছে কত জন্ম ধরে হাঁটছে, নীল পাহাড়ও যেন এত দূরে ছিল না। আশেপাশের সব স্থির হয়ে গেল, রোগীদের গোঙানি, ফিনাইলের গন্ধ, নার্সদের বিরক্তিমাখা কণ্ঠ, স্বজনদের উদ্বিগ্ন মুখ কিছুই নেই যেন। এগারো নম্বর বেডের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মানিক। একজন বৃদ্ধা শুয়ে আছে, তার পাশে কেউ নেই। একেবারে সাধারণ বৃদ্ধা, রাস্তায় এরকম কত জনকে দেখেছে, ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে রাস্তা পার হয় তারা, ফুটপাতে তাদের পেছনে হাঁটা মানুষরা খুব বিরক্ত হয় এদের স্থবিরতায়। লোকাল বাসে উঠলে হেল্পার চ্যাংরা ছেলেদের উঠিয়ে উনাদের বসতে দেন। মানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, একজন নার্স এসে কর্কশ কণ্ঠে বলল—

আপনে কে? রোগীর কে হন?

আমি রোগীর কেউ না, আমি ডা. মানিক।

নার্সের চোখ একটু কোমল হলো। মানিক জিজ্ঞাসা করল—

উনার নাম কী?

নার্স তার হাতের ফাইল উল্টে বলল—

উনার নাম রহিমা বেগম। উনার সাথের লোকেরা উনাকে রেখে চলে গেছে।

মানিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

এই বেডে চঞ্চলা চক্রবর্তী নামে যে রোগী ছিল তিনি কোথায়?

তিনি তো তিন দিন আগেই মারা গেছেন।

মানিক আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, হাঁটু গেড়ে মেঝেতেই বসে পড়ল, নার্স উদ্বিগ্ন হয়ে বলল—

স্যার কী হয়েছে?

কিছু না, আপনি যান।

রহিমা বেগম জেগে উঠল, মানিককে তার বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল—

আমার পুতে আইছে?

মানিক বলল—

না আপনার ছেলে আসেনি, মনে হয় আসবে না।

কে কইছে, পেত্যেক দিন আহে, কিন্তু ট্যাহা নাই অসুদ কিনার, হেইলাইগা নাসগো ফাঁকি দিয়া লুকাইয়া আমার কাছে আহে।

আপনার ছেলে আসলে তাকে বলবেন, আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে মাকে দেখে যেতে হবে না। আপনার ওষুধের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

রহিমা বেগমের চোখে সুখের ঝিলিক দেখা গেল। মানিক তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—

আপনি কি একটু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিবেন?

রহিমা বেগম বিস্মিত হলো এই আবদারে, তার দুর্বল হাত উঠিয়ে মানিকের মাথায় ঠিকই হাত বুলিয়ে দিল, বলল,

দোয়া করিগো বাপ, আল্লায় তোমার ভালো করুক। তোমার মতো পুত হোক সবাইর।

মানিক আর পারল না, চোখের বাঁধ ভেঙে গেল। বিছানায় মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। রহিমা বেগম পরম আদরে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, তার মাথায় মায়ের হাতের পরশ বুলাচ্ছে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে মানিক চিঠিটি বের করল, এই চিঠির বোঝা আর বইতে পারবে না সে। অনেক সুযোগে আগলে রাখা চিঠিটি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে রাস্তায় উড়িয়ে দিল।

বংশালে নিজের কাগজের বাড়িতে এসে মানিক আশ্চর্য হয়ে গেল। বেশ হইচই করে ঘুড়ি আর ফুল নিয়ে কিছু বাচ্চা ছেলেরা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। উঠানে ঝুলানো দড়িতে একটি স্যান্ডো গেঞ্জি আর একটি লুঙ্গির সাথে একটি শাড়িও ঝুলছে। ঝকঝকে উঠানে একটাও শুকনো পাতা নেই। কলপাড়ে শ্যাওলাদের রাজ্য কেউ উচ্ছেদ করে দিয়েছে। বারান্দায় ইজি চেয়ারে বদরুল আলম সাহেব বসে আছেন, আর নিচে সিঁড়িতে কার্তিক। দুজনেই মনোযোগ দিয়ে পত্রিকা পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন স্কুলের পড়া মুখস্থ করছে।

উঠানের ধারে রান্না ঘরে একটি মেয়ে চুলা ধরাচ্ছে। মানিক এগিয়ে আসতেই কার্তিকের চোখে পড়ল। তার মুখটা দুপুরের দিঘীর জলের মতো ঝিকমিক করে উঠল। বদরুল আলমও অবাক খুশিতে তাকিয়ে আছে। কার্তিক তো হইচই শুরু করে দিল, রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে বলল—

কই গো এই দিকে আসো, দেখো কে আসছে।

রান্নাঘর থেকে যে মেয়েটি বেরিয়ে এলো, তার মুখে মায়ার প্রতিচ্ছবি। কার্তিক পরিচয় করিয়ে দিল—

এ তোমার দেওর, মানিক।

মেয়েটি মাথায় ঘোমটা টেনে বলল—

না, উনি আমার দাদা।

তারপর পায়ে ধরে সালাম করল মানিককে। মানিক হতবিহ্বল হয়ে বলল—

তোমার নাম নিশ্চয়ই করিমন? তোমাকে আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই দেয়ার নেই আমার।

আপনি অনেক কিছু দিছেন, আর কিছু লাগব না।

যা দিয়েছি তা আমার ছিল না কোনোদিন। এই বাড়ি মরতে বসেছিল, তুমি এসে প্রাণ ফিরিয়ে দিলে। এটা তোমারই বাড়ি। আমাকে শুধু একটু থাকার জায়গা দিও।

দাদা এমন কথা বললে কিন্তু এ বাড়িতে জায়গা হবে না।

মানিক শুধু একটু হাসল। বদরুল আলম সাহেব এগিয়ে এসে বললেন,

ছুটি নিয়ে এসেছ?

না স্যার, চাকরি ছেড়ে দিব।

ভালো, আমিও চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

তারপর করিমনের দিকে তাকিয়ে বললেন—

কই গো মা, একটু চা দাও তো, তোমার হাতে চা না খেলে যে আমার দিনই শুরু হয় না।

বদরুল আলমের গলাটা যেন সুধীর দত্তর মতোই শোনাল।

মানিক চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা ক্লিনিকে ডিউটি করে এক বেলা। বিকেলবেলা কার্তিকের দেয়া ফার্মেসিতে বসে রোগী দেখে। মাঝে মাঝে রহিমা বেগমের মতো রোগীরা যখন শাড়ির আঁচল খুলে খুচরো পয়সা বের করে দিতে যায় তখন মানিক বলে—

লাগবে না, একটু মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ দিলেই হবে।

ব্যস্ত শহরে এইটুকু সুখ মাঝে মাঝে তার কপালে জুটে। নিজেকে বড় বেমানান মনে হয় তার এখানে। কার্তিকের বাজার নিয়ে প্রতিদিন খুনসুটি করে করিমন, পত্রিকা থেকে চোখ সরিয়ে বদরুল আলম সাহেব তা দেখেন আর হাসেন। তাদের ধামাকোর জন্যই চায়ের দাবি করেন। এই নাটকে মানিক নিজের জন্য কোনো চরিত্র খুঁজে পায় না। সবাই তাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, তবু নিজেকে বেমানান একটা আসবাব মনে হয় তার।

পাহাড়ের সেই বালকের মতো তার পেট পুড়ে। মাচাং ঘরের পাশে ছোট পাহাড়টির জন্য, কাজাচাই-এর জন্য, উথাই খায়াচিং-এর জন্য, ত্রাসিমার জন্য। সব ছেড়ে আবার ফিরতে ইচ্ছা করে পাহাড়ে, সে শুধু অপেক্ষা করে একটা আহ্বানের।

মংতো পাহাড়িদেরকে আবার জুম চাষে ফিরিয়ে এনেছে। সে পাহাড়িদের হিংসা-ঘৃণা শিখায় না, প্রতিবাদ করতে শিখায়, নিজেদের রক্ষা করতে শিখায়। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে সে পপি ক্ষেত খুঁজে বেড়ায়। তারপর পথ চিনিয়ে দেয় সেনাবাহিনীকে। পত্রিকায় খবর আসে—

'বান্দরবানে পঞ্চাশটি পপি ক্ষেত ধ্বংস করল সেনাবাহিনী'। সেই খবরে কোথাও মংতোর নাম আসে না। কেউ জানে না পাহাড়ের এই বিপ্লবীর খবর।

শফিক সাহেবকে আর দেখেনি কেউ। পপি চাষে তার সম্পৃক্ততা সবাই জানে কিন্তু কোনো এক জাদুবলে পত্রিকায় তার নাম আসেনি। অনেকে বলে তিনি মিয়ানমার চলে গেছেন, কেউ বলে দেশেই লুকিয়ে আছেন কোথাও।

উথাইয়ের মানিক মারমা হাঁটতে শিখেছে। কোনোমতেই থামানো যায় না তাকে, তার কোমরে পিতলের একটা ছোট ঘন্টা লাগিয়ে দিয়েছে উথাই, সারাক্ষণ টুংটাং বাজে। ঘন্টার সেই শব্দ তার মনে সুখের দোলা দেয়। মানিক প্রথম যেদিন আধো আধো বুলিতে 'মুই' ডেকে উথাইয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তারপরের তিন দিন কেঁদেছে উথাই। সময় পেলেই বলে—

আবার ডাক বু।

থায়াচিংও কান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছে, সে সময় পেলেই মানিককে 'বা' ডাকা শেখায়।

ক্রাসিমা স্কুল দিয়েছে বলিপাড়ায়। সেখানে জামরুল গাছের নিচে বসে তার স্কুল। কাজাচাই সে স্কুলের পিয়ন। স্কুলে বাংলা-ইংরেজির পাশাপাশি মারমাও শেখানো হয়। ক্রাসিমা স্বপ্ন দেখতে শেখায় শিশুদের। নিজের স্বপ্নের কথা বলে। সারাদিন পাহাড়ে কাজ শেষ করে ধূলিমাখা পায়ে নারী-পুরুষরাও তাদের মাচাং ঘরের বারান্দায় বসে সে স্বপ্নের কথা শুনে, তাদের চোখের তারায় জ্বলে ওঠে সে স্বপ্নগুলো।

কিছু স্বপ্নের কথা সবাইকে বলতে পারে না ক্রাসিমা। সেগুলো মানিককে বলে, চিঠি লিখে। সে চিঠি কখনো পায় না মানিক, ক্রাসিমা কুপির আগুনে পুড়িয়ে ফেলে সে চিঠিগুলো। সে ভাবে, হয়তো কোনো একদিন কুপির আগুনে আত্মাহুতি দিবে না চিঠিগুলো।

মানিকও সেই 'কোনো একদিনের' অপেক্ষা করে থাকে।

একদিন চিঠি পায় মানিক। প্রেরকের ঘরটা খালি। যার চোখে সাঙ্গু নদী বয় সে পাঠিয়েছে চিঠিটি, তার চোখের জলে আঁকাবাঁকা ঢেউ হয়েছে চিঠিতে। চিঠিতে কিছু লেখা নেই, শুধু অশ্রু আছে। সাদা চিঠিটি মেলে ধরে কলমে কালি ভরে মানিক লিখল, ক্রাসিমা।

তারপর ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে দিল।